প্রথম আলো

বাংলাদেশে দারিদ্র্য পরিস্থিতি: বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন

দারিদ্র্যের হার কয়েক দশক কমার পর ৪ বছর ধরে বাড়ছে

দেশে দরিদ্র ৩ কোটি ৬০ লাখ

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন

বাংলাদেশ দারিদ্র্য কমানোর দিক থেকে বিশ্বে সুনাম কুড়িয়েছিল। কিন্তু এখন পেছন দিকে হাঁটছে।

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দারিদ্র্য কমানোর ক্ষেত্রে উল্টো পথে হাঁটছে বাংলাদেশ। বিশ্বব্যাংক বলছে, দেশে ঢার বছর ধরে দারিদ্র্যের হার বাড়ছে। সংস্থাটির অনুমিত হিসাব, ২০২৫ সালে দারিদ্র্যের হার হতে পারে ২১ শতাংশের কিছু বেশি। দেশে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩ কোটি ৬০ লাখ।

দেশের জনসংখ্যার বড় একটি অংশ দারিদ্র্যসীমার কিছুটা ওপরে থাকে। তারা উচ্চ মূল্যস্ফীতির মতো বিভিন্ন আঘাতের কারণে দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে যাওয়ার ঝুঁকিতে থাকে। বিশ্বব্যাংকের হিসাবে ২০২২ সালে সংখ্যাটি ছিল ৬ কোটি ২০ লাখ।

দেশে দারিদ্র্যের হার হিসাব করে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)। সংস্থাটির খানা আয়-ব্যয় জরিপে এ তথ্য উঠে আসে। সর্বশেষ খানা আয়-ব্যয় জরিপ করা হয়েছিল ২০২২ সালে। তখন সার্বিক দারিদ্র্য হার ছিল ১৮ দশমিক ৭ শতাংশ।

বিশ্বব্যাংকের হিসাবটি মূলত প্রাক্কলন, যা করা হয়েছে 'মাইক্রো-সিমুলেশন মডেল' নামের একটি পদ্ধতি ব্যবহার করে। শ্রমবাজারের গতিশীলতা, প্রবাসী আয় এবং সরকারের ভর্তুকি ব্যয়কে ভিত্তি ধরে মাইক্রো-সিমুলেশন মডেলে দারিদ্র্যের হার পর্যালোচনা করা হয়েছে বলে জানিয়েছে বিশ্বব্যাংক।

বাংলাদেশে বিগত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশক থেকে উল্লেখযোগ্য হারে দারিদ্র্য কমতে শুরু করে (১৯৯১-৯২ সালে ছিল ৫৬ দশমিক ৭ শতাংশ)। ২০০০ সালের পর থেকে তা আরও গতি পায়। বাংলাদেশ দারিদ্র্য কমানোর দিক থেকে বিশ্বে সুনাম কুড়িয়েছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, সে ক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ পেছন দিকে হাঁটছে।

'বাংলাদেশ: দারিদ্র্য ও বৈষম্য বিশ্লেষণ, সমৃদ্ধির পথে অগ্রযাত্রা' শীর্ষক প্রতিবেদনে বিশ্বব্যাংক

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

> বিশ্বব্যাংকের তথ্য দেখায়, এটি কোনো আকস্মিক পতন নয়, এটাই বাস্তবতা, দারিদ্র্য বেড়েছে।
>
> **হোসেন জিল্লুর রহমান,** নির্বাহী চেয়ারম্যান, পিপিআরসি

> দারিদ্র্য বেড়েছে, এটা বিভিন্ন গবেষণা সংস্থার প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। কিন্তু বিবিএস এই বিষয়ে নীরব ছিল।
>
> **সেলিম রায়হান,** অর্থনীতিবিদ

‘আমার বেটাকে বাঁচান’, চিকিৎসা খরচ মেটাতে হাত পাতছেন তাঁরা

সহায়তা প্রার্থনা ও ভিক্ষাবৃত্তি

প্রথম আলো ৫০ জনের সঙ্গে কথা বলেছে। ৩৮ জনই বলেছেন, তাঁরা চিকিৎসা খরচ মেটাতে মানুষের সাহায্য চাইছেন।

আহমেদ উল্যা ইউসুফ, *ঢাকা*

চিকিৎসা ব্যয় মেটানো	৩৮ জন
কর্মসংস্থান হারানো	৬ জন
আয় দিয়ে সংসার চলে না	৪ জন
দুর্যোগে বাড়িঘর হারানো	২ জন

রাজধানীর কারওয়ান বাজার মেট্রোরেল ষ্টেশনের একটি প্রবেশ পথের সামনে দাঁড়িয়ে সাহায্যের জন্য হাত পাতছিলেন মরিয়ম বেগম (ছদ্মনাম)। আর্তনাদের সুরে বলছিলেন, 'আমার বেটাকে বাঁচান, সাহায্য করেন। আমি অসহায় হয়ে রাস্তায় নামছি। বেটাকে হারালে আমার আর কেউ থাকবে না।'

এই দৃশ্য চোখে পড়ে গত ২৭ সেপ্টেম্বর। মরিয়ম সাহায্য চেয়েই যাচ্ছিলেন। কিন্তু সাড়া খুব একটা পাচ্ছিলেন না। কাছে গিয়ে কথা বললাম তাঁর সঙ্গে। তিনি বললেন, তাঁর এক ছেলে, এক মেয়ে। ছেলে একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকের ছাত্র। মেয়েটি সরকারি একটি কলেজে পড়ে। ছেলে ক্যানসার ধরা পড়ে আট মাস আগে। তাঁর চিকিৎসা ব্যয় মেটাতেই মানুষের সহায়তা চাইছেন।

মরিয়ম বেগম বিভিন্ন জায়গা থেকে আর্থিক সহায়তা পেয়েছেন। ছেলের সহপাঠীরাও সাহায্য করেছেন। তবে তা যথেষ্ট নয়। এ জন্য মরিয়মকে হাত পাততে হচ্ছে। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ছেলের চিকিৎসায় খরচ হয়েছে ১০ লাখ টাকার বেশি। এর মধ্যে ছিল তাঁর প্রয়াত স্বামীর রেখে যাওয়া তিন লাখ টাকা। ছেলের চিকিৎসা খরচ জোগাতে তাঁরা এখন প্রায় নিঃস্ব।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

দেশে দরিদ্র ৩ কোটি ৬০ লাখ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দারিদ্র্যের হারের নতুন হিসাব দিয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর এক হোটেলে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয় এবং আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে বিশ্বব্যাংক ও সেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট (পিআরআই)।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পিপিআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান হোসেন জিল্লুর রহমান। তিনি দেশে দারিদ্র্য কমার অতীত চিত্র তুলে ধরে বলেন, ২০২২ থেকে ২০২৫ সাল দুর্ভাগ্যজনকভাবে 'উল্টো ঘুরে যাওয়ার' সময়কাল। বিশ্বব্যাংকের তথ্য দেখায়, এটি কোনো আকস্মিক পতন নয়, এটাই বাস্তবতা, দারিদ্র্য বেড়েছে।

পিপিআরসিও দারিদ্র্য হার নিয়ে গত আগস্টে জরিপ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সেখানে বলা হয়, ২০২৫ সালে দেশের সার্বিক দারিদ্র্য বেড়ে ২৭ দশমিক ৯৩ শতাংশ হয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন অনুসারে, বর্তমানে মাসিক মাথাপিছু আয় ২ হাজার ৭৫০ টাকা হলে নিম্ন দারিদ্র্যসীমা এবং ৩ হাজার ৮৩২ টাকা হলে মোট দারিদ্র্যসীমা ধরা হয়।

দারিদ্র্য কেন বাড়ছে

বিশ্বব্যাংকের সিনিয়র অর্থনীতিবিদ সার্জিও অলিভিয়েরো অনুষ্ঠানে প্রতিবেদনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। এতে দারিদ্র্য বৃদ্ধির কারণ হিসেবে মোটাদাগে যথেষ্ট কর্মসংস্থান সৃষ্টি না হওয়া, চাকরি হারানো, উচ্চ মূল্যস্ফীতি, মজুরি সেভাবে বৃদ্ধি না পাওয়া ইত্যাদিকে দায়ী করা হয়েছে। সংস্থাটি বলছে, ২০২৩ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে ২০ লাখ কর্মসংস্থান কম হয়েছে। ২০২৫ সালে আরও ৮ লাখ কর্মসংস্থান কম হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। চাকরির বাজার সংকুচিত হওয়ার সবচেয়ে বড় ধাক্কাটি পড়েছে নারী ও তরুণদের ওপর।

২০১৬ সালের পর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধরনে পরিবর্তন এসেছে বলে মনে করে বিশ্বব্যাংক। সংস্থাটি বলেছে, এ সময়ে সামগ্রিকভাবে বছরে প্রায় ১৫ লাখ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। তবে তার ৬৩ শতাংশই হয়েছে কৃষি খাতে। কৃষিতে কর্মসংস্থানে আয় কম। শহরে কর্মসংস্থান সৃষ্টি অনেকটা স্থবির ছিল।

ধনীরা বেশি সামাজিক সুরক্ষা পায়

সরকারের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির সুবিধা গরিবদের চেয়ে ধনীরা বেশি পায়। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন অনুসারে, ২০২২ সালে সবচেয়ে দরিদ্র ২০ শতাংশ পরিবারের মাত্র অর্ধেক এসব সামাজিক সহায়তা পেয়েছে। অথচ সবচেয়ে ধনী ২০ শতাংশ পরিবারের ৩৫ শতাংশও এসব সুবিধা পেয়েছে।

বিশ্বব্যাংক বলছে, বাংলাদেশে সামাজিক খাতে সরকারি ব্যয় বাড়িয়েছে ঠিকই, তবে উপকারভোগী নির্বাচনের দুর্বলতা এসব ব্যয়ের প্রত্যাশিত প্রভাবকে অনেকটাই খর্ব করে দিচ্ছে। ভর্তুকি দেওয়ার পদ্ধতিগত সমস্যার কারণে তুলনামূলক সচ্ছল পরিবারই এর সুবিধা বেশি পায়। ফলে দারিদ্র্য হ্রাস ও বৈষম্য কমানোর অগ্রগতি সীমিত হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির পরিধি বেড়েছে, তবে এর বাস্তবায়ন ও উপকারভোগী নির্বাচন অদক্ষ বলেও উল্লেখ করা হয় বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে। এতে বলা হয়, ২০১০ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে শহরে সামাজিক সহায়তার আওতা হ্রাস পেয়েছে। ১৯ শতাংশ থেকে বেড়ে তা সাড়ে ৩৪ শতাংশ হয়েছে। সংখ্যার দিক থেকে এটা বেশ ভালো। তবে এসব সুবিধা সচ্ছল মানুষের কাছে যাওয়া বন্ধ করা যায়নি।

২০৫০ সালে ১.৩০ কোটি মানুষ বাস্তুচ্যুত হতে পারে

বিশ্বব্যাংক বলছে, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি বাংলাদেশের দারিদ্র্য ও আঞ্চলিক বৈষম্য কমানোর ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য হুমকির মুখে ফেলতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন ২০৫০ সাল নাগাদ ১ কোটি ৩০ লাখ মানুষকে বাস্তুচ্যুত করতে পারে। কৃষি খাতে জিডিপির (মোট দেশজ উৎপাদন) প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত কমিয়ে দিতে পারে।

বাংলাদেশে আঞ্চলিক বৈষম্য, বিশেষ করে দেশের পূর্ব-পশ্চিম বৈষম্য কমানোর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। ২০১০ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে পশ্চিমাঞ্চল এবং উচ্চ দারিদ্র্যপ্রবণ এলাকায় গরিব মানুষের সংখ্যা দ্রুত কমেছে। কিন্তু বিভিন্ন বছরের জলবায়ুজনিত ঝুঁকি ভবিষ্যতে আঞ্চলিক বৈষম্য বাড়াতে পারে মনে করে বিশ্বব্যাংক। বিশ্বব্যাংকের মতে, বন্যা ও খরা গ্রামীণ পরিবারের ওপর অসামঞ্জস্যভাবে প্রভাব ফেলে। এসব অভিঘাত থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর তাদের সামর্থ্য অনেকটাই নির্ভর করে স্থানীয় অবকাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ওপর।

চার সুপারিশ

দারিদ্র্য কমার গতি বাড়াতে চারটি সুপারিশ করেছে বিশ্বব্যাংক : এক. উৎপাদনশীল খাতে কর্মসংস্থানের ভিত্তি মজবুত করা; দুই. দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য শোভন কর্মসংস্থানের সুযোগ বিস্তৃত করা; তিন. গ্রামের দরিদ্রদের জন্য কার্যকর বাজারব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং চার. সমতাভিত্তিক ও দক্ষ রাজস্বনীতির মাধ্যমে ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষমতা বৃদ্ধি।

অনুষ্ঠানে পিপিআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান হোসেন জিল্লুর রহমান বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনের দারিদ্র্য পরিস্থিতিকে তিনটি সময়কাল ধরে বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন, ২০১০ থেকে ২০১৬ সাল সময়কাল পুরোনো গতিময়তার ধারাবাহিকতা। এ সময় দারিদ্র্য হ্রাস ও প্রবৃদ্ধির সম্পর্ক উল্টো পথে না গেলেও তার ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছিল। দ্বিতীয় পর্ব ২০১৬ থেকে ২০২২ সাল, যখন দারিদ্র্য কমার গতি কমেছে। ওই সময়ে এক নতুন রাজনৈতিক অর্থনীতি তৈরি হয়েছে, ঋণনির্ভর অবকাঠামোগত উন্নয়ন সবকিছু ছাপিয়ে গেছে। নিয়মভিত্তিক সমাজের জায়গা নিয়েছে দুর্নীতিনির্ভর প্রণোদনা। রাজনৈতিক গণতন্ত্রের অবক্ষয়কে আরও জোরদার করেছে অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের দুর্বলতা।

হোসেন জিল্লুর রহমানের মতে, ২০২২ থেকে ২০২৫ সাল 'উল্টো ঘুরে যাওয়ার' সময়কাল। তিনি বলেন, 'আমরা এখন বহু মোড়ের সামনে—এলডিসি (স্বল্পোন্নত দেশ) উত্তরণ, মধ্যম আয়ের দেশ, নির্বাচিত সরকারের প্রত্যাবর্তন। কিন্তু আমরা কতটা প্রস্তুত?'

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন উপস্থাপনের পর অর্থনীতিবিদেরা এর ওপর আলোচনা করেন। এই পর্ব সঞ্চালনা করেন বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) নির্বাহী পরিচালক সেলিম রায়হান। তিনি বলেন, বিগত কয়েক বছরে দারিদ্র্য বেড়েছে, এটা বিভিন্ন গবেষণা সংস্থার প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। কিন্তু বিবিএস এই বিষয়ে নীরব ছিল।

এই পর্বে বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, টেকসই দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্যোগ নিতে হবে। টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য বেশ কিছু সুপারিশ করেছে সরকার গঠিত খেতমজুর প্রণয়ন কমিটি। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনেও সেই নির্দেশনা আছে।

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) মহাপরিচালক এনামুল হক বলেন, দারিদ্র্য বিমোচনে এ দেশে সরকারি বিনিয়োগ গুরুত্ব অনেক বেশি। কৃষি খাতের উন্নয়ন করা উচিত। কারণ, ৪২ শতাংশ জনগোষ্ঠী কৃষি খাতের ওপর নির্ভরশীল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য সায়মা হক বিদিশা বলেন, মানুষের আয় বাড়াতে মানসম্মত বা শোভন কাজের ব্যবস্থা করতে হবে। এতে দারিদ্র্যও কমবে।

কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে উদ্যোক্তাদের অর্থায়নের সুবিধা সৃষ্টি করার ওপর জোর দেন ব্র্যাক-আরএফএল গ্রুপের পরিচালক উজমা চৌধুরী। তিনি বলেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপরও দারিদ্র্য কমা বা বৃদ্ধির বিষয়টি নির্ভর করে।

বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর জ্যঁ পেম উল্লেখ করেন, প্রথাগতভাবে দারিদ্র্য কমানোর গতি বাড়ানো যাবে না। যুবক, নারী ও ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর জন্য কাজের ব্যবস্থা করতে হবে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিয়ারআইয়ের চেয়ারম্যান জাহিদি সাত্তার। তিনি বলেন, গত কয়েক দশকে বিপুলসংখ্যক মানুষ দারিদ্র্যসীমার ওপরে উঠেছে। নিজেদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করেছে। কিন্তু এখন দারিদ্র্য কমার পরিবর্তে বেড়েছে।

এ ছাড়া অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বিশ্বব্যাংকের রিজিওনাল প্র্যাকটিস ডিরেক্টর সেনাত্তিয়ান একাউটি।

CamScanner

সাক্ষাৎকার

ভূমিকম্পের ক্ষতি মোকাবিলায় আধুনিক সরঞ্জাম জরুরি

ড. সারওয়ার জাহান

ড. সারওয়ার জাহান বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের সাবেক অধ্যাপক। ২০১৭ সালে তিনি এ প্রতিষ্ঠান থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ২০০০ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে বুয়েটের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের প্রধান, স্থাপত্য ও পরিকল্পনা অনুষদের ডিন এবং সেন্টার ফর রিজিওনাল ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৭ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় আরবানা-চ্যাম্পেইন থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। শিক্ষকতা গবেষণা ও পরামর্শদানে তার ৩৫ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্পে পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করেছেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে তার ৪০টিরও বেশি গবেষণামূলক প্রকাশনা রয়েছে। তিনি নগর পরিকল্পনা সম্পর্কিত দুটি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন; বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত একটি গ্রন্থের সহ-লেখক। বর্তমানে পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। ভূমিকম্পসহ বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবিলায় করণীয় নিয়ে তিনি যুগান্তরের সঙ্গে কথা বলেছেন। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **মোহাম্মদ কবীর আহমদ**

যুগান্তর : *কয়েকদিন আগে দেশে যে ভূমিকম্প (রিখটার স্কেলে ৫ দশমিক ৭, আবার কারও মতে ৬ মাত্রার) হলো, এর তীব্রতা ছিল স্মরণকালের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ। এ ঘটনায় হাইরাইজ বিল্ডিংয়ে বসবাসকারীরা সবচেয়ে বেশি আতঙ্কিত হয়েছিলেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, দেশে আরও বড় ভয়াবহ ভূমিকম্প হওয়ার আশঙ্কা প্রবল। ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি ন্যূনতম পর্যায়ে রাখাতে কী পদক্ষেপ নিতে হবে?*

ড. সারওয়ার জাহান : আমাদের দেশে অপরিকল্পিত নগরায়ণ হয়েছে। তাই ভয়াবহ ভূমিকম্প হলে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। রাজধানীসহ সারা দেশে যথাযথ নিয়ম না মেনে অনেক ভবন তৈরি করা হয়েছে। সেসব ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের কাঠামো রাতারাতি পরিবর্তন করা না গেলেও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি (রেট্রোফিটিং) অবলম্বন করে ঝুঁকি কমানো সম্ভব। এসব কথা আমরা বহুদিন বললেও মনুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলোকে ঝুঁকিমুক্ত করার জন্য জোরালো পদক্ষেপ নিয়েছে—এমন দৃষ্টান্ত দৃশ্যমান নয়। বরং ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের তথ্য মানুষ গোপন করার চেষ্টা করে থাকে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলোর উচিত এসব ভবন চিহ্নিত করে সেগুলোকে ঝুঁকিমুক্ত করতে জোরালো পদক্ষেপ নেওয়া। সারা দেশে প্রতিটি ভবন যাতে যথাযথ নিয়ম মেনে তৈরি করা হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য জোরালো মনিটর করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা তাদের দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করছেন কি না, এজন্যও জোরালো মনিটরিং প্রয়োজন। নিয়ম না মেনে কেউ ভবন তৈরি করছে—এমন তথ্য পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্টদের যথাযথ আইনের আওতায় আনতে হবে।

যুগান্তর : *কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণ করে বলেন, ৭ মাত্রার ভূমিকম্প ১০০ থেকে ১২৫ বছর এবং ৮ মাত্রার ভূমিকম্প ২৫০ থেকে ৩০০ বছর পরপর ফিরে আসার আশঙ্কা থাকে। অতীতে এ অঞ্চলে তীব্র মাত্রার যেসব ভূমিকম্প হয়েছে, তেমন ভূমিকম্প মোকাবিলায় আমাদের কী ধরনের আগাম প্রস্তুতি নেওয়া দরকার?*

সারওয়ার জাহান : যে কোনো সময় তীব্র মাত্রার ভূমিকম্প হতে পারে। এটি বিবেচনায় নিয়েই আমাদের নগর পরিকল্পনা করতে হবে এবং পরিকল্পনার বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে।

যুগান্তর : *তীব্র মাত্রার ভূমিকম্প হলে রাজধানীতে কী ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে?*

সারওয়ার জাহান : বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিবেচনায় নিলে এটা স্পষ্ট হয় যে, তীব্র মাত্রার ভূমিকম্প হলে রাজধানীতে অনেক ভবন ধসে পড়তে পারে; গ্যাসলাইন থেকে বিভিন্ন স্থানে অগ্নিকাণ্ডের মতো ভয়াবহ ঘটনা ঘটতে পারে; বিদ্যমান সড়ক যোগাযোগব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এমন আরও অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত ও ভয়াবহ ঘটনা ঘটতে পারে, যার কারণে একসঙ্গে অনেক মানুষের হতাহত হওয়ার আশঙ্কা প্রবল।

যুগান্তর : *তেমন পরিস্থিতি মোকাবিলায় কী ধরনের প্রস্তুতি নিতে হবে?*

সারওয়ার জাহান : তেমন পরিস্থিতি মোকাবিলায় আগে থেকেই জোরালো প্রস্তুতি নিতে হবে। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী কর্মী বাহিনীর পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবক দলও গড়ে তুলতে হবে। রাজধানীতে খালি জায়গার সংকট তীব্র। অনেক জায়গায় দুই ভবনের মাঝে পর্যাপ্ত জায়গার অভাব রয়েছে। তীব্র মাত্রার ভূমিকম্প হলে রাজধানীতে বিভিন্ন স্থানে ভবনে আটকে পড়া মানুষকে দ্রুততম সময়ে উদ্ধার করা এক বড় চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখে দিতে পারে। যেসব এলাকায় সড়ক সরু, সেখানে ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি ঢুকতে পারবে না। সরু সড়কের কারণে আরও নানা সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। মনে রাখা দরকার, তখন ফায়ার সার্ভিসের ভবনও ভেঙে যেতে পারে। সে পরিস্থিতি মোকাবিলায় করণীয় নির্ধারণ করতে হবে। সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও কর্মী তৈরি করতে হবে। তীব্র মাত্রার ভূমিকম্প হলে বিদ্যমান সড়ক যোগাযোগব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কাজেই ভবনে আটকে পড়া মানুষকে দ্রুততম সময়ে উদ্ধার করার জন্য বিকল্প পথে ক্ষতিগ্রস্তদের কাছে পৌঁছাতে হবে। এ লক্ষ্যে রাজধানীতে প্রয়োজনীয়সংখ্যক খাল খনন করা দরকার। একসময় রাজধানীতে অনেক খাল ছিল, সেসব উদ্ধার করতে হবে; পাশাপাশি নতুন করে আরও খাল খনন করতে হবে। আকাশপথেও যাতে জোরালো উদ্ধার তৎপরতা চালানো যায়, সেজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

যুগান্তর : *আপনি বলছিলেন, তীব্র মাত্রার ভূমিকম্প হলে গ্যাসলাইন থেকে বিভিন্ন স্থানে অগ্নিকাণ্ডের মতো ভয়াবহ ঘটনা ঘটার আশঙ্কা রয়েছে। তেমন পরিস্থিতি মোকাবিলায় কী করণীয়?*

সারওয়ার জাহান : এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরাই ভালো বলতে পারবেন। সাধারণভাবে বলা যায়, তেমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে অনেক মানুষ আহত হবে। আমাদের দেশে আগুন নেভানোর কাজে পানির সংকট দেখা দেয়। এ সমস্যা দূর করার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। আহতদের দ্রুত চিকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে। আমাদের হাসপাতাল ভবনগুলোকে এমনভাবে তৈরি করতে হবে, যাতে তীব্র মাত্রার ভূমিকম্পে আশপাশের অন্য ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হলেও হাসপাতালের ভবনগুলো ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী আগাম পদক্ষেপ নেওয়া হলে ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনা সম্ভব।

যুগান্তর : *কী ধরনের আগাম পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে?*

সারওয়ার জাহান : তীব্র মাত্রার ভূমিকম্প হলে সম্ভাব্য যে পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে, তা বিবেচনায় নিয়ে মোকাবিলায় পদক্ষেপ নিতে হবে। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তৈরি করে নিয়মিত মহড়া দিতে হবে। রাজধানীসহ সারা দেশে যথাযথ নিয়ম না মেনে তৈরি করা ভবনগুলো কম মাত্রার ভূমিকম্পেও ধসে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। রানা প্লাজার ঘটনার পর যে ধরনের উদ্ধার তৎপরতা দেখেছি, তাতে আমাদের কর্তৃপক্ষগুলোর সক্ষমতা সম্পর্কে আমরা একটা ধারণা পেয়েছি। তীব্র মাত্রার ভূমিকম্পে রাজধানীতে একসঙ্গে অনেক ভবন ধসে পড়লে পরিস্থিতি মোকাবিলায় করণীয় নিয়ে আগে থেকেই ভাবতে হবে।

যুগান্তর : *১৯৫৯ সালে যে পরিকল্পনা করা হয়েছিল, তা ছিল ঢাকার ১৫ লাখ মানুষের জন্য। ১৯৭৪ সালে ঢাকার লোকসংখ্যা ছিল ২০ লাখের মতো; ১৯৮০ সালে প্রায় ৩৫ লাখ। বর্তমানে এ মহানগরীর লোকসংখ্যা প্রায় দুই কোটি। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঢাকায় নগর পরিকল্পনা যথাযথভাবে হয়েছে কি?*

সারওয়ার জাহান : সেই ১৯৫৯ সালে ১৫ লাখ লোকের জন্য ঢাকায় যে নগর পরিকল্পনা করা হয়েছিল, বলা যায় প্রায় সেই পরিকল্পনা দিয়েই এখনো চলছে। একজন সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষের বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন চাহিদা তৈরি হয়। সে চাহিদা পূরণ না করলে তার নানাবিধ শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। তেমনই একটি শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এর বিভিন্ন রকমের চাহিদা তৈরি হয়। সেসব চাহিদা পূরণ করতে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া না হলে ধীরে ধীরে নানারকম সমস্যা তৈরি হয়। দুঃখজনক হলেও সত্য, ঢাকায় নগর পরিকল্পনার ক্ষেত্রে তেমনটিই ঘটেছে।

যুগান্তর : *মাটির গঠনগত বৈশিষ্ট্যের কারণে তীব্র মাত্রার ভূমিকম্পে ঢাকা শহরের ক্ষয়ক্ষতি কেমন হতে পারে?*

সারওয়ার জাহান : ঢাকার অনেক এলাকা নরম মাটির ওপর গড়ে উঠেছে। সেসব এলাকায় ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতি বেশি হবে এটাই স্বাভাবিক। কাজেই ঢাকার যেসব এলাকার মাটি তুলনামূলক নরম, সেসব এলাকার স্থাপনার সুরক্ষায় বিশেষ পদক্ষেপ নিতে হবে।

> যেসব দেশে ঘনঘন ভূমিকম্প হয়, সেসব দেশের মানুষ ভূমিকম্পের সঙ্গে মানিয়ে চলার কৌশল শিখেছে। সেসব দৃষ্টান্ত থেকে আমাদেরও শিক্ষা নিতে হবে। তীব্র মাত্রার ভূমিকম্প মোকাবিলায় ভূমিকম্প সহনীয় টেকসই ভবন নির্মাণ করতে হবে। পাশাপাশি জনগণকে সচেতন করার জন্য ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে। সমন্বিত পদক্ষেপ নেওয়া হলে ভূমিকম্পসহ যে কোনো দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি ন্যূনতম পর্যায়ে রাখা সম্ভব

যুগান্তর : *ভূমিকম্পের কথা উঠলে দেশের ছোট-বড় অন্যান্য শহরের ক্ষয়ক্ষতির প্রসঙ্গটি আসে।*

সারওয়ার জাহান : ভূমিকম্প বা যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় দেশের ছোট-বড় সব শহরের ক্ষয়ক্ষতি ন্যূনতম পর্যায়ে রাখতে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী আগাম পদক্ষেপ নেওয়া দরকার।

যুগান্তর : *ভূমিকম্প বা যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অসহায়ত্ব তীব্র হয়।*

সারওয়ার জাহান : তখন শুধু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাই নন, সিনিয়র সিটিজেনদের অসহায়ত্বও তীব্র হয়। কাজেই সব ধরনের চ্যালেঞ্জ বিবেচনায় নিয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলায় যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে।

যুগান্তর : *প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় উন্নত দেশগুলোকেও হিমশিম খেতে হয়।*

সারওয়ার জাহান : তা ঠিক। সেসব তথ্য বিবেচনায় নিয়ে ভূমিকম্প বা যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় আমাদের সক্ষমতা বাড়াতে হবে, তাতে ক্ষয়ক্ষতি ন্যূনতম পর্যায়ে রাখা সম্ভব হবে।

যুগান্তর : *এসব ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় কী কী বিষয়ে গুরুত্ব বাড়াতে হবে?*

সারওয়ার জাহান : প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বাড়াতে হবে। রাজধানীমুখী জনস্রোত বন্ধ করার পদক্ষেপ নিতে হবে। রাজধানীমুখী জনস্রোত বন্ধ করা সম্ভব না হলে আগামী দিনে অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণে আধুনিক নগর ব্যবস্থাপনায় নানা সংকট দেখা দেবে। এ বিষয়ে উচ্চপর্যায়ের গবেষণা অব্যাহত রাখতে হবে।

যুগান্তর : *প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় আধুনিক নগর ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব কী?*

সারওয়ার জাহান : অপরিকল্পিত নগরায়ণের কারণে কী সমস্যা সৃষ্টি হয়, তা আমরা জানি। শুধু আমাদের দেশেই নয়, বহু দেশে অপরিকল্পিত নগরায়ণ হয়েছে। সিঙ্গাপুরের পুরো শহরটিকে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। যে কোনো শহরে সফলভাবে পুনর্নির্মাণ সম্পন্ন করা বেশ কঠিন। সিঙ্গাপুরের একেকটি এলাকায় নগরীর বিভিন্ন সংস্থা এবং স্থানীয় জনগণের মধ্যে ধারাবাহিক বৈঠক হয়েছে। স্থানীয় জনগণের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে তারপর সেখানে পরিকল্পিত উন্নয়নকাজ সম্পন্ন করা হয়। কুয়ালালামপুরেও সফলভাবে পুনর্নির্মাণকাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। বস্তুত এমন আরও বহু দেশে সফলভাবে শহর পুনর্নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। আমাদেরও উচিত সেসব দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে পুরান ঢাকার অতি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলোয় পুনর্নির্মাণকাজ শুরু করা। এটি করতে দেরি হলে পুরান ঢাকায় যে কোনো দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি ন্যূনতম পর্যায়ে রাখা কঠিন হতে পারে। অন্যান্য শহরেও অতি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলোয় পুনর্নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নে যথাযথ উদ্যোগ নিতে হবে।

যুগান্তর : *প্রতিবছর অগ্নিকাণ্ডে দেশে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতি ন্যূনতম পর্যায়ে রাখতে কী করণীয়?*

সারওয়ার জাহান : যদি কোনো কারণে শহরে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়, তাহলে দ্রুত আগুন নেভানোর জন্য প্রস্তুতি রাখতে হয়। এক্ষেত্রে কোনোরকম ঘাটতি থাকলে দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি ন্যূনতম পর্যায়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। আগুন নেভাতে পানির ভূমিকা অপরিহার্য। সেজন্য সব আধুনিক শহরের সর্বত্রই বিদ্যমান পানির লাইনের পাশাপাশি শুধু আগুন নেভানোর কাজে ব্যবহারের জন্য বিশেষ ধরনের একটি পানির লাইন তৈরি করা দরকার। সেই লাইনে পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা রাখতে হবে। আগুনের ধরন বুঝে পানির পাশাপাশি অন্যান্য উপকরণের ব্যবস্থাও রাখতে হবে।

যুগান্তর : *লক্ষ করা যায়, অবৈধ বিদ্যুতের লাইন, অবৈধ গ্যাসলাইনের কারণেও বহু অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।*

সারওয়ার জাহান : শহরে অবৈধ বৈদ্যুতের লাইন, অবৈধ গ্যাসলাইনের বিষয়ে জোরালো অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে। মানহীন কেবলের কারণেও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটতে পারে। কাজেই ভবনে বা কোনো মার্কেটে যাতে কেউ মানহীন কেবল ব্যবহার করতে না পারে, সেদিকেও কর্তৃপক্ষকে নজর দিতে হবে। সারা দেশে এলপিজির ব্যবহার বেড়েছে। এক্ষেত্রে সিলিন্ডার বিপণন, বিশেষত পরিবহণে যেন যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে।

যুগান্তর : *প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় বিশেষ সতর্কতামূলক কী কী পদক্ষেপ নিতে হবে?*

সারওয়ার জাহান : শহরের সব ঝুঁকিপূর্ণ স্থাপনা চিহ্নিত করে সেগুলো থেকে মানুষকে সরাতে হবে। ভবন নির্মাণে যথাযথ নিয়ম মানা এবং অগ্নিনির্বাপণের ব্যবস্থা থাকাই যথেষ্ট নয়। কয়েক বছর আগে গুলশানের বহুতল এক ভবনে আগুন লাগার পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে সতর্কসংকেত বেজে উঠেছিল; কিন্তু অনেকেই তা আমলে নেয়নি। এছাড়া যারা অ্যালার্ম শুনে ভবনের বিভিন্ন তলা থেকে বের হয়েছিলেন, তাদের অনেকে জরুরি নির্গমন সিঁড়ি ব্যবহার করেননি। বস্তুত যথাযথ সচেতনতা ও সতর্কতার অভাবে যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি বেড়ে যেতে পারে।

যুগান্তর : *তীব্র মাত্রার ভূমিকম্পসহ বড় কোনো দুর্যোগে উদ্ধার তৎপরতা চালানোর জন্য পর্যাপ্ত সরঞ্জামের অভাব আছে দেশে, এ বিষয়টি বারবার আলোচনায় আসে। এ সীমাবদ্ধতা কাটাতে কী করণীয়?*

সারওয়ার জাহান : তীব্র মাত্রার ভূমিকম্প বা বড় কোনো দুর্যোগ মোকাবিলায় যেসব সরঞ্জাম প্রয়োজন, সেসব ক্রয় করতে প্রচুর অর্থের দরকার। দুর্যোগ মোকাবিলায় আধুনিক সরঞ্জাম ক্রয় করতে হবে। সেসব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করতে হবে এবং সেসব সরঞ্জাম চালানোর মতো প্রশিক্ষিত জনবল তৈরি করতে হবে। বড় কোনো দুর্যোগে বিভিন্ন দেশ থেকে উদ্ধারকারী দল আসবে। তাদের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। দুর্যোগ মোকাবিলায় আন্তর্দেশীয় জোরালো উদ্যোগ নিতে হবে।

যুগান্তর : *যে কোনো দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি ন্যূনতম পর্যায়ে রাখতে কী করণীয়?*

সারওয়ার জাহান : যেসব দেশে ঘনঘন ভূমিকম্প হয়, সেসব দেশের মানুষ ভূমিকম্পের সঙ্গে মানিয়ে চলার কৌশল শিখেছে। সেসব দৃষ্টান্ত থেকে আমাদেরও শিক্ষা নিতে হবে। তীব্র মাত্রার ভূমিকম্প মোকাবিলায় ভূমিকম্প সহনীয় টেকসই ভবন নির্মাণ করতে হবে। পাশাপাশি জনগণকে সচেতন করার জন্য ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে। বস্তুত সমন্বিত পদক্ষেপ নেওয়া হলে ভূমিকম্পসহ যে কোনো দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি ন্যূনতম পর্যায়ে রাখা সম্ভব।

যুগান্তর : *সফলভাবে দুর্যোগ মোকাবিলায় এককথায় আপনার পরামর্শ কী?*

সারওয়ার জাহান : কোনো দুর্যোগের পর বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ যেভাবে ব্যাপক পরিসরে কাজ শুরু করে, সেসব তৎপরতায় যেন ভাটা না পড়ে, তা নিশ্চিত করতে হবে। দুঃখজনক হলো, কোনো দুর্যোগের পরপর বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ যেভাবে কাজ করার কথা বলে—পরে কাজের ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যায় না। এককথায় যদি বলি—কেমিক্যাল গোডাউনের মতো বিপজ্জনক উপাদান আবাসিক এলাকা থেকে দূরে সরানো না হলে নিরাপদ নগরীর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুধু কাগজে-কলমেই থেকে যাবে।

যুগান্তর : *আপনাকে ধন্যবাদ।*

সারওয়ার জাহান : ধন্যবাদ।

CamScanner

কুটিরশিল্প

টিকে থাকার লড়াইয়ে পিছিয়ে

আরিফুল ইসলাম রাফি

গ্রামবাংলার একসময়কার সকালের পরিচিত দৃশ্য ছিল- কোথাও কুমারের চাকা ঘুরছে, কোথাও তাঁত বেজে উঠছে ছন্দে, কোথাও তালপাতার পাখা কাটছে একজন নারী আর দূরে কারও উঠোনে দা দিয়ে বাঁশ চেঁছে কেউ বানাচ্ছে ঝুড়ি। বাতাসে মিশে থাকত মাটির গন্ধ, খড়ের চাটাইয়ের তন্তুর ঘ্রাণ আর কোথাও কোথাও পাটের শুকনো গন্ধ। এই দৃশ্যগুলো শুধু একটি শিল্পের নয়, বরং একটি পরিপূর্ণ সমাজব্যবস্থার অংশ ছিল। কুটিরশিল্প শুধু কর্মসংস্থান নয়। এ ছিল সংস্কৃতির বাহক, গ্রামীণ আত্মপরিচয়ের অনুষঙ্গ, মানবিক সৃষ্টিশীলতার এক নিখুঁত প্রতীক। কিন্তু আজ সেই পরিচিত দৃশ্য ধীরে ধীরে স্মৃতির অ্যালবামে চলে যাচ্ছে। কুটিরশিল্পের মানুষরা যারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে হাতের কাজে বাঁচতেন, তারা এখন দাঁড়িয়ে আছেন গভীর সংকটের মুখে। সময়, সমাজ, অর্থনীতি, বৈশ্বিক বাজার- সব মিলিয়ে কুটিরশিল্প আজ এমন এক লড়াইয়ে নেমেছে, যেখানে বেঁচে থাকাই কঠিন হয়ে পড়েছে। আর কঠিন এই লড়াইয়ে তারা অনেক ক্ষেত্রেই পরাজিত হয়ে পড়ছেন।

বাংলার কুটিরশিল্পের ইতিহাস হাজার বছরেরও পুরানো। মাটির প্রত্ননিদর্শন, পাথরের খোদাই, প্রাচীন গ্রন্থের বিবরণ; সবই এ কথা বলে যে এই ভূমি একসময় হাতের কাজের অনন্য শিল্পে সমৃদ্ধ ছিল। সিন্ধু সভ্যতার পোড়ামাটির পুতুলের মতোই বাংলা অঞ্চলেও পাওয়া গেছে প্রাচীন কলা নিদর্শন। পাল-সেন যুগে নকশিকাঁথা, তাঁত, পটচিত্র, ধাতুশিল্প আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছিল। মধ্যযুগে গড়ে ওঠে বাঁশ ও বেতশিল্প, পাটশিল্প, তাঁত-বয়ন। মোগল আমলে ধাতুশিল্প ও কাঠের নকশাখোদাই শীর্ষে ওঠে। ব্রিটিশ আমলে তাঁতশিল্প ও হাতের কাজ বৈশ্বিক বাজারে সাড়া ফেলেছিল।

কুটিরশিল্প শুধু উৎপাদন নয়, এটি ছিল সমাজ-পরিবার-অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দু। একসময় অর্থনীতি ছিল খুবই স্থানীয়। প্রতিটি গ্রামে প্রয়োজনমতো উৎপাদক ছিল; কারিগর, তাঁতি, কামার-কুমোর, সুতা কাটার মহিলা, বুননকারিগর প্রভৃতি। আজ সেই কাঠামো ভেঙে পড়েছে। আর ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যাচ্ছে শিল্পটিও। কেন কুটিরশিল্প টিকতে পারছে না? এর উত্তর খুঁজতে হলে সামনে আসে বেশকিছু বিষয়। যেমন- এখনকার মানুষ সস্তা ও দ্রুত উৎপাদিত পণ্য চায়। মেশিনে তৈরি প্লাস্টিকের জিনিসপত্র, স্টিলের সামগ্রী, সস্তা ফ্যাশন- সবই কুটিরশিল্পের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

একটি মেশিন দিনে হাজার পণ্য বানাতে পারে। কিন্তু একজন কারিগর বানাতে পারে হয়তো ৫-১০টি। ফলে দাম কমে, বাজার সয়লাব হয়। আর হাতের কাজ বাজার হারায়। আগে গ্রামের পাশে পাওয়া যেত প্রয়োজনীয় উপকরণ। কিন্তু আজ বাঁশের দাম দ্বিগুণ-তিন গুণ। সুতা, রং, কাঠ, খড়- সবকিছুর দাম লাগামহীন। নদীর মাটি মিলছে না, অপ্রাকৃতিক পরিবর্তনে জিনিসের ঘাটতি। উৎপাদন খরচ বাড়ছে কিন্তু মূল্য বাড়ানোর স্বাধীনতা নেই। কারণ বাজারে তখন গ্রাহক কিনবে না। কারিগরের ছেলে এই পেশায় আসতে চায় না। কারণ আয় কম, সামাজিক সম্মান কম, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, পরিশ্রম বেশি। ফলে প্রজন্মান্তরে কারিগরের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। একটি শিল্প যখন উত্তরাধিকার হারাতে থাকে, তখন তার মৃত্যু নিশ্চিত। বাজারে কুটিরশিল্পের পণ্য বিক্রি হয়। কিন্তু সেই পণ্যের আসল মূল্য কে পায়? একটি পণ্যের দাম যদি হয় ১ হাজার টাকা, কারিগর পায় ৩০০-৪০০ টাকা। মধ্যস্বত্বভোগী পায় বাকি ৬০০-৭০০ টাকা। এই অন্যায় ব্যবস্থায় কারিগর কেবল বেঁচে থাকার জন্য কাজ করে, উন্নতি করতে পারে না। সরকার কাগজে-কলমে অনেক প্রকল্প গ্রহণ করে। কিন্তু মাঠপর্যায়ে তার ভালো ফল পাওয়া যায় না। কারিগরদের রয়েছে নানা অভিযোগ। যেমন- প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থ পেতে লাগে দালালের সহায়তা, প্রশিক্ষণ হয় শহরে, গ্রামের মানুষ যেতে পারে না। লোনের কাগজপত্র জটিল, মূল্য নির্ধারণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেই, মার্কেটিং ব্যবস্থা দুর্বল। ফলে সহায়তা থাকলেও সেটির সুফল পৌঁছায় না অনেক প্রান্তিক শিল্পীর কাছে।

চীনসহ অন্যান্য দেশ থেকে আসে সস্তা, রঙিন, আকর্ষণীয় পণ্য। মানুষ ভাবে, একই জিনিস তো কম দামে পাওয়া যাচ্ছে, তবে ঘরোয়া কেন? এভাবে দেশের বাজারই বিদেশি পণ্যের দখলে চলে যাচ্ছে। স্থানীয় শিল্পী টিকতে পারছে না। আজকের যুগ অনলাইনের। কিন্তু কারিগরদের স্মার্টফোন নেই, ইন্টারনেট সম্পর্কে ধারণা নেই, ছবি তুলে পোস্ট করতে পারেন না, অনলাইনে লেনদেন জানেন না। ফলে অনলাইন বাজার মধ্যস্বত্বভোগীদের দখলে, কারিগরের নয়। গ্রামের মানুষ এখন শহরমুখী। প্রবাসে যাচ্ছে বহু যুবক। কারখানায় শ্রমিক হচ্ছে হাজারো মানুষ। কেউ আর ঘরে বসে হাতের কাজ করতে চায় না। একসময় যে দাদিমা নকশিকাঁথা সেলাই করতেন, তার নাতনি হয়তো এখন গার্মেন্টসে কাজ করেন। একসময় যে কুমোর ৫০টি মাটির হাঁড়ি বানাতেন, আজ তিনি শহরে রিক্সা চালান; কারণ অনিশ্চিত শিল্প করে তিনি পরিবার চালাতে পারেন না।

কুটিরশিল্প হারালে আমরা হারাচ্ছি আমাদের ঐতিহ্য, সৃজনশীলতা আর দেশীয় অর্থনীতি। এ পণ্যগুলো শুধু পণ্য নয়; এগুলো আমাদের ইতিহাস, সংস্কৃতি, শেকড়, পরিচয়। শিল্পী মানেই সৃষ্টিশীলতা, হাতের কাজ মানেই মৌলিকতা। মেশিন কখনই তা পারে না। কুটিরশিল্প দেশের GDP-তে বড় অবদান রাখার ক্ষমতা রাখে। গ্রামে হাজার হাজার পরিবার এ দিয়ে বাঁচত। এখন সেই পথ হারিয়ে যাচ্ছে। একটি কুটিরশিল্প পুরো একটি পাড়াকে কর্মসংস্থান দিতে পারে। কিন্তু এখন আর সেই সুযোগ নেই। হাতে তৈরি পণ্য পরিবেশবান্ধব। মেশিনের প্লাস্টিক পণ্য পরিবেশের ক্ষতি করে। কুটিরশিল্প হারানো মানে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক হারানো। বিদেশিরা আজও বাংলাদেশের নকশিকাঁথা, মাটির পণ্য, পাটের ব্যাগ, বাঁশের ঝুড়ি দেখে মুগ্ধ হয়। বাংলাদেশ চাইলে এই শিল্প পুনরুজ্জীবিত করতে পারে। এজন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। যেমন- কারিগরদের ন্যায্যমূল্য দেওয়া। কারিগররা যাতে তাদের পণ্যের ন্যায্যমূল্য পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। অনলাইন বিক্রির প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে। কারিগরদের জন্য বিশেষ বাজার বা 'ক্রাফট ভিলেজ' গড়ে তোলার পাশাপাশি বিদেশে রপ্তানির সুবিধা বাড়াতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থায় কুটিরশিল্প অন্তর্ভুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি জেলা শহরে নিয়মিত কুটিরশিল্প মেলা আয়োজন করতে হবে। মধ্যস্বত্বভোগীর আধিপত্য কমিয়ে সরাসরি কারিগরদের সঙ্গে ক্রেতার যোগাযোগের ব্যবস্থা করতে হবে।

কুটিরশিল্প আজ সত্যিই বেঁচে থাকার লড়াইয়ে পরাজিত। কিন্তু এই পরাজয় আমরা চাইলে চূড়ান্ত হতে দিতে পারি না। কারণ কুটিরশিল্প শুধু একটি শিল্প নয়; এটি আমাদের শেকড়, আমাদের মাটির গন্ধ, আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের ইতিহাস, আমাদের পরিচয়। হাতে বানানো একটি মাটির প্রদীপ যখন নিভে যায়, তখন নিভে যায় শুধু আলো নয়; নিভে যায় এক শিল্পীর আত্মবিশ্বাস, নিভে যায় একটি গ্রামের আনন্দ, নিভে যায় এক সমাজের ঐতিহ্য। কুটিরশিল্প হারাচ্ছে, কিন্তু এটি এখনো বাঁচানো সম্ভব। আমাদের ইচ্ছা, আমাদের সচেতনতা এবং রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ- এই তিন একসঙ্গে কাজ করলেই এই শিল্প আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে। কারণ সৃষ্টিশীলতা কখনই পুরোপুরি মরে না, হারিয়ে যেতে পারে কিছুদিন, কিন্তু ফিরে আসার শক্তি তার চিরকাল থাকে।

লেখক : শিক্ষার্থী
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

CamScanner

ঢাকার বিষবায়ু
প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতা ও নাগরিক উদাসীনতার যৌথ ফসল

আল শাহারিয়া

কল্পণা করুন এক শীতের সকাল। ঘন কুয়াশার চাদরে মুড়ে আছে রাজধানী ঢাকা। কিন্তু এই ধোঁয়াশা কেবল প্রাকৃতিক কুয়াশা নয়, এর সাথে মিশে আছে ভাসমান সিসা, কার্বন আর অতি সূক্ষ্ম বস্তুকণা (পিএম ২.৫)-এর এক প্রাণঘাতী মিশ্রণ। এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স বা একিউআই (AQI) মিটারের কাঁটা প্রায় প্রতিদিনই লাল থেকে বেগুনি, অর্থাৎ অস্বাস্থ্যকর থেকে বিপজ্জনক স্তরে ওঠানামা করছে। এই চিত্র এখন আর নতুন নয়। বিশ্বের দূষিততম শহরের তালিকায় ঢাকার এই শীর্ষস্থান দখল এখন এক বার্ষিক রুটিন। এই বিষাক্ত বাতাস নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা কম হয় না। তবে সেই আলোচনার পুরোটাই এক অদ্ভুত ব্লেম গেম বা দোষারোপের খেলায় পর্যবসিত হয়েছে। চায়ের দোকানে, অফিস কক্ষে কিংবা সামাজিক মাধ্যমে আমরা অনবরত আঙুল তুলে যাচ্ছি। সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমরা এই ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্য সরকারকে দায়ী করছি, দায়ী করছি পরিবেশ অধিদপ্তর বা সিটি কর্পোরেশনের মতো সেবা সংস্থাগুলোর চূড়ান্ত ব্যর্থতাকে।

অন্যদিকে, সরকার বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো হয়তো দায়ী করছে শিল্প মালিকদের, বিশেষ করে শহরের চারপাশে গজিয়ে ওঠা হাজার হাজার অবৈধ ইটের ভাটাকে। আবার শিল্প মালিকরা হয়তো অজুহাত দিচ্ছেন আইনের শাসনের অভাব বা দুর্বল অবকাঠামোর। এই চক্রাকার দোষারোপের খেলায় আমরা সবাই ব্যস্ত। কিন্তু এই যে বিষাক্ত বাতাসের এক ককটেল আমরা প্রতিদিন সেবন করছি, সেই ককটেল তৈরিতে আমাদের নিজেদের, অর্থাৎ সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমাদের ভূমিকা ঠিক কতটুকু? সময় এসেছে সেই নির্মোহ আত্মসমালোচনার। এই ভয়াবহ দূষণের পেছনের মূল চালিকাশক্তি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতা। এটি একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য এবং একে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। আমাদের পরিবেশ অধিদপ্তরের যে ধরনের কঠোর নজরদারি এবং আইন প্রয়োগের ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন ছিল, বাস্তবে তার সিকিভাগও দৃশ্যমান নয়। যে শিল্প-কারখানাগুলো দিনরাত কালো ধোঁয়া উদগীরণ করে বাতাসকে বিষাক্ত করছে, তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির উদাহরণ বিরল।

একইভাবে, দুই সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ত্রুটি এই সংকটকে তীব্রতর করেছে। উন্মুক্ত ডাম্পিং, সময়মতো বর্জ্য অপসারণ না করা এবং সবচেয়ে ভয়াবহ-বর্জ্য পোড়ানো, এই সবই দূষণের মাত্রাকে বাড়িয়ে তুলছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে নিয়ন্ত্রণহীন নির্মাণযজ্ঞ। বড় বড় সরকারি-বেসরকারি প্রকল্প থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত বাড়ি নির্মাণ– কোথাও নির্মাণবিধি মানার নজির নেই। ধুলা নিয়ন্ত্রণের জন্য পানি ছিটানো বা নির্মাণসামগ্রী ঢেকে রাখার মতো সামান্যতম নিয়মগুলোও এখানে উপেক্ষিত। এটি হলো সমস্যার সেই দিক, যা আমরা সবাই দেখি এবং যা নিয়ে আমরা সরব। কিন্তু মুদ্রার অপর পিঠটি আরও বেশি উদ্বেগজনক।

এবার সময় সেই আয়নার সামনে দাঁড়ানোর, যা আমরা সচেতনভাবে এড়িয়ে চলি। এই কলামের মূল ফোকাস সেই নাগরিক উদাসীনতা, যা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতার চেয়ে কম দায়ী নয়। প্রথমেই আসা যাক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আমাদের ব্যক্তিগত ভূমিকার কথায়। সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার অব্যবস্থাপনা নিয়ে আমরা সোচ্চার। কিন্তু আমরা নিজেরা কী করছি? সামান্য অলসতা বা চূড়ান্ত অসচেতনতার কারণে আমরা অনেকেই নিজেদের বাড়ির আশপাশে, রাস্তার মোড়ে বা খোলা জায়গায় অবলীলায় প্লাস্টিক, পলিথিনসহ গৃহস্থালির যাবতীয় আবর্জনা ফেলে দিই এবং সুযোগ পেলে তাতে আগুন ধরিয়ে দিই। এই পোড়ানো আবর্জনা থেকে যে ডায়োক্সিন এবং ফিউরানের মতো মারাত্মক বিষাক্ত রাসায়নিক বাতাসে মেশে, তা সরাসরি ক্যানসারের কারণ হতে পারে। যে বাতাসকে আমরা দূষিত বলে গালি দিচ্ছি, সেই বাতাসে বিষ মেশানোর এই প্রক্রিয়ায় আমরা নিজেরাই একেকজন সক্রিয় কর্মী। দ্বিতীয়ত, আমাদের ব্যক্তিগত গাড়ির প্রতি অন্ধ আসক্তি। ঢাকার ট্রাফিক জ্যাম এবং বায়ু দূষণের একটি বড় অংশই আসে জীবাশ্ম জ্বালানিচালিত যানবাহন থেকে। আমরা জানি, অপ্রয়োজনে ব্যক্তিগত গাড়ি নিয়ে রাস্তায় নামলে তা যানজট এবং দূষণ দুটোই বাড়াবে। তবুও, সামান্য দূরত্বে যেতে কিংবা নিছক সামাজিক মর্যাদা বা বিলাসিতা প্রদর্শনের জন্যও আমরা ব্যক্তিগত গাড়ির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি। একটি কার্যকর গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে না পারা অবশ্যই সরকারের ব্যর্থতা। কিন্তু সেই অজুহাতে আমাদের এই ব্যক্তিগত বিলাসিতা কি পরিবেশের প্রতি আমাদের চূড়ান্ত দায়িত্বহীনতার পরিচায়ক নয়? তৃতীয়ত, নির্মাণকাজে আমাদের নিজস্ব উদাসীনতা। আমরা যখন অন্যের নির্মাণকাজের ধুলায় অতিষ্ঠ হয়ে কর্তৃপক্ষকে দোষারোপ করি, তখন আমরা কি ভেবে দেখেছি, নিজের বাড়ি বা ফ্ল্যাটটি নির্মাণের সময় আমরা কতটা আইন মেনেছি? নিজের বাড়ি তৈরির সময়ও ইট, বালু, সিমেন্ট খোলা ফেলে রাখা, পানি না ছিটানো বা ধুলা নিয়ন্ত্রণের ন্যূনতম ব্যবস্থা না নেওয়ার যে প্রবণতা, তা আমাদের দ্বৈত মানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ। আমরা অন্যের কাছে যা আশা করি, নিজেরা তা পালন করতে বিন্দুমাত্র রাজি নই।

সবচেয়ে ভয়াবহ হলো আমাদের সামাজিক উদাসীনতা। আমাদের চোখের সামনেই হয়তো কোনো কারখানা কালো ধোঁয়া ছাড়ছে, কোনো ফিটনেসবিহীন বাস রাজপথ কাঁপিয়ে বিষাক্ত ধোঁয়া ছড়াচ্ছে কিংবা কোনো আবাসন প্রকল্প জলাভূমি ভরাট করে পরিবেশ ধ্বংস করছে। আমরা কজন এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করি? আমরা কজন দায়িত্ব নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানাই? আমাদের এই আমার কী আসে যায় বা এসব করে কী লাভ হবে মনোভাবই দূষণকারীদের মূল শক্তি। আমরা প্রতিবাদ করি না, কারণ আমরা ধরে নিয়েছি কিছুই বদলাবে না। এই প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতা এবং নাগরিক উদাসীনতা একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এটি একটি ভয়াবহ দুষ্টচক্র তৈরি করেছে। যখন একজন নাগরিক দেখেন যে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোই দুর্নীতিগ্রস্ত বা নিষ্ক্রিয়, তখন তিনিও আইন ভাঙতে উৎসাহিত হন। তিনি ভাবেন, ওরা কিছুই করে না, আমি একাই বা নিয়ম মেনে কী করব? তার এই মনোভাব প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। অন্যদিকে, প্রতিষ্ঠানগুলো যখন দেখে যে, জনগণই পরিবেশ নিয়ে সচেতন নয়, তারা নিজেরাই যত্রতত্র আবর্জনা ফেলছে, প্লাস্টিক পোড়াচ্ছে, তখন তারাও নিষ্ক্রিয় থাকার অজুহাত পেয়ে যায়। তারা ভাবে, জনগণই তো সচেতন না, আমরা আর কী করব?

এভাবেই, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতা নাগরিক উদাসীনতাকে উসকে দেয় এবং নাগরিক উদাসীনতা প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও অকার্যকর ও জবাবদিহিহীন করে তোলে। এই যৌথ ব্যর্থতার চক্রেই আজ ঢাকার বাতাস আটকা পড়েছে।

বাস্তবতা হলো, ঢাকার এই বিষবায়ু আমাদের সম্মিলিত পাপের ফসল। এই দায় এককভাবে সরকার, কোনো সংস্থা বা শিল্প মালিকদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে আমাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের আর কোনো সুযোগ নেই। আমরা একযোগে এই বাতাসকে বিষিয়ে তুলেছি– সরকার তার নিষ্ক্রিয়তা দিয়ে, আর আমরা নাগরিকরা আমাদের দায়িত্বহীনতা দিয়ে। কেবলমাত্র একটি ভালো মানের মাস্ক পরে হয়তো আমরা সাময়িকভাবে নিজেদের ফুসফুসকে কিছুটা সুরক্ষা দিতে পারব, কিন্তু এটি কোনো স্থায়ী সমাধান নয়। যদি আমরা সত্যিই একটি নির্মল বাতাসের শহরে নিঃশ্বাস নিতে চাই তবে এই দোষারোপের খেলা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

ঢাকার বাতাসকে পরিচ্ছন্ন করার এই লড়াই কোনো একক পক্ষের নয়। এটি একটি সমন্বিত সামাজিক আন্দোলনের বিষয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা আমাদের নাগরিক দায়িত্ববোধ এবং প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা– এই দুই চাকা সচল করতে পারছি, ততক্ষণ এই বিষাক্ত ককটেল থেকে আমাদের মুক্তি নেই। সমাধানের শুরুটা হতে হবে ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে। প্রতিটি নাগরিককে নিজের দায়িত্বটুকু পালন করতে হবে– তা আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলা হোক, অপ্রয়োজনে গাড়ি ব্যবহার না করা হোক, বা নিজের নির্মাণকাজে আইন মানা হোক। একইসঙ্গে, ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি আমাদের সম্মিলিতভাবে সোচ্চার হতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতার বিরুদ্ধে, আইনের প্রয়োগহীনতার বিরুদ্ধে আমাদের কথা বলতে হবে। প্রাতিষ্ঠানগুলোকে তাদের দায়িত্ব পালনে জবাবদিহি করতে বাধ্য করতে হবে।

ঢাকার বাতাসকে পরিচ্ছন্ন করার এই লড়াই কোনো একক পক্ষের নয়। এটি একটি সমন্বিত সামাজিক আন্দোলনের বিষয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা আমাদের নাগরিক দায়িত্ববোধ এবং প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা– এই দুই চাকা সচল করতে পারছি, ততক্ষণ এই বিষাক্ত ককটেল থেকে আমাদের মুক্তি নেই। সমাধানের শুরুটা হতে হবে ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে। প্রতিটি নাগরিককে নিজের দায়িত্বটুকু পালন করতে হবে– তা আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলা হোক, অপ্রয়োজনে গাড়ি ব্যবহার না করা হোক, বা নিজের নির্মাণকাজে আইন মানা হোক। একইসঙ্গে, ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি আমাদের সম্মিলিতভাবে সোচ্চার হতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতার বিরুদ্ধে, আইনের প্রয়োগহীনতার বিরুদ্ধে আমাদের কথা বলতে হবে

লেখক: শিক্ষার্থী
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

CamScanner

জলবায়ু পরিবর্তন : আশীর্বাদ নাকি অভিশাপ

জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে আলোচিত ও চিন্তার বিষয়। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে পৃথিবীর আবহাওয়া, তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত ও ঋতুচক্রে দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তন ঘটে। ভৌগোলিক অবস্থান, নিম্ন উচ্চতা ও ঘন জনবসতির কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বাংলাদেশেও সবচেয়ে তীব্রভাবে অনুভূত হয়। প্রশ্ন হলো—এই পরিবর্তন কি বাংলাদেশের জন্য আশীর্বাদ, নাকি অভিশাপ?

যদিও সামান্য কিছু ইতিবাচক দিক রয়েছে, তবু বাস্তবে এটি বাংলাদেশের জন্য এক গভীর অভিশাপের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর একটি হচ্ছে বাংলাদেশ। প্রতি বছরই জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে বন্যা, খরা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয় সৃষ্টি হচ্ছে। এর প্রভাবে ঘূর্ণিঝড় 'সিডর', 'আইলা' ও 'আম্পান'-এর মতো দুর্যোগের সংখ্যা ও তীব্রতা ক্রমেই বাড়ছে। এছাড়াও দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি, উত্তরাঞ্চলে গরমকালে অতিরিক্ত গরম ও শীতকালে অতিরিক্ত শীত অনুভূত হওয়া, মধ্যাঞ্চলে বন্যা ও নদীভাঙন—সব মিলিয়ে কৃষি, স্বাস্থ্য ও জীবিকায় বড় প্রভাব পড়ছে। তাছাড়াও উপকূলীয় অঞ্চলে লাখ লাখ মানুষ ঘর হারাচ্ছে। তাই বাংলাদেশের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন নিঃসন্দেহে একটি অভিশাপ।

সবশেষে বলা যায়, জলবায়ু পরিবর্তন মানবসভ্যতার জন্য এক গভীর সতর্কবার্তা। যদিও কিছু ক্ষেত্রে এটি নতুন সুযোগ তৈরি করে, কিন্তু এর ক্ষতি ও বিপর্যয় তুলনাহীন। যদি এখনই কার্যকর পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাংলাদেশ হবে এক অনিরাপদ ও অনাবাসযোগ্য স্থান। তাই জলবায়ু পরিবর্তনের এই অভিশাপকে রোধ করতে আমাদের সকলের সম্মিলিত সচেতনতা ও উদ্যোগই একমাত্র পথ।

তাকবির জাহান, শিক্ষার্থী, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

CamScanner

বাংলাদেশে ভূমিকম্প : ঝুঁকি, ইতিহাস ও প্রস্তুতি

ড. ইঞ্জিনিয়ার রিপন হোড়

ভূমিকম্প হচ্ছে এমন এক বিভীষিকার নাম, যা কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে একটি জনপদকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করতে পারে। ভূমিকম্প সাধারণত কয়েক সেকেন্ড থেকে এক অথবা দুই মিনিট স্থায়ী হয়ে থাকে। একবার কোনো এলাকায় ভূমিকম্প হওয়ার পর একই স্থানে অথবা কাছাকাছি অঞ্চলে বেশ কয়েক বার ভূমিকম্প হতে পারে। একে 'আফটার শক' বলে। ভূমিকম্পের ক্ষেত্রে ইপি সেন্টার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইপি সেন্টার হলো যেখানে ভূমিকম্প উৎপন্ন হয়। সারা বিশ্বে প্রতি মুহূর্তে কোথাও না কোথাও তীব্র অথবা স্বল্প মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হচ্ছে। ইউনাইটেড স্টেট জিওলজিক্যাল সার্ভের ওয়েব সাইটে প্রতিনিয়ত পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা মাত্রার ভূমিকম্পের তথ্য প্রকাশ করা হয়।

অনেক আগে পৃথিবীর সব স্থলভাগ একত্রে ছিল। পৃথিবীর ওপরিভাগ কতগুলো অনমনীয় প্লেটের সমন্বয়ে গঠিত বলে ধীরে ধীরে এগুলো আলাদা হয়ে গেছে। এ প্লেটগুলোকেই বিজ্ঞানীরা বলেন টেকটোনিক প্লেট। আর দুটি টেকটোনিক প্লেটের মধ্যে থাকা ফাটলকে ফল্ট লাইন বলা হয়। ভূমিকম্পের জন্য ফল্ট লাইনের বড় ভূমিকা রয়েছে। ফল্ট লাইন দিয়ে দুই প্লেটের মধ্যে সংঘর্ষ হলে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়। মূলত টেকটোনিক প্লেটগুলো একে অন্যের সঙ্গে পাশাপাশি যুক্ত থাকে। কোনো কারণে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ হলেই তৈরি হয় শক্তি। এ শক্তি সিসমিক তরঙ্গ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। যদি তরঙ্গ শক্তিশালী হয়, তাহলে সেটি পৃথিবীর ওপরি ভাগে এসে ভূমিকে কাঁপিয়ে তোলে। এ কাঁপুনিই ভূমিকম্প। সারা বিশ্বকে সাতটি মেজর প্লেটে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হলো—আফ্রিকা প্লেট, ইউরেশিয়া প্লেট, অ্যান্টারটিক প্লেট, ইন্দো-অস্ট্রেলীয় প্লেট, নর্থ আমেরিকান প্লেট, প্যাসিফিক প্লেট ও সাউথ আমেরিকান প্লেট। বাংলাদেশের ভূমিকম্প বলতে বাংলাদেশ ও তৎসংলগ্ন এলাকার ভূমিকম্পকে বোঝায়। বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি ভূতাত্ত্বিক চ্যুতি এলাকা বা ফল্ট জোন সচল অবস্থায় রয়েছে। এগুলো হচ্ছে—বগুড়াচ্যুতি এলাকা, রাজশাহীর তানোরচ্যুতি, ত্রিপুরাচ্যুতি, সীতাকুন্ড টেকনাফ চ্যুতি, হালুয়াঘাটচ্যুতি ডাওকীচ্যুতি, ডুবরিচ্যুতি, চট্টগ্রামচ্যুতি, সিলেটের শাহজীবাজারচ্যুতি (আংশিক-ডাওকীচ্যুতি) এবং রাঙ্গামাটির বরকলে রাঙ্গামাটিচ্যুতি এলাকা। বাংলাদেশ ভারতীয়, ইউরেশীয় ও বার্মার (মিয়ানমার) টেকটোনিক প্লেটের মধ্যে অবস্থান করছে। ভারতীয় ও ইউরেশীয় প্লেট দুটি (১৯৩৪ সালের পর থেকে) দীর্ঘদিন ধরে হিমালয়ের পাদদেশে আটকা পড়ে আছে, অপেক্ষা করছে বড় ধরনের নড়াচড়া অর্থাৎ ভূকম্পনের।

যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লেমন্ট ডোহের্টি আর্থ অবজারভেটরি ভূতাত্ত্বিকের এক গবেষণায় জানা গেছে, বাংলাদেশের নিচে টেকটোনিক প্লেটের চাপ জমে উঠছে কম করে হলেও গত ৪০০ বছর ধরে। এ চাপ যখন মুক্ত হবে, তখন সৃষ্ট ভূমিকম্পের মাত্রা দাঁড়াতে পারে ৮.২ রিখটার। এমনকি তা রিখটার স্কেলে ৯ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। এ বিষয়ে বাংলাদেশের আর্থকোয়ার্ক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিব ও বুয়েটের পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক মেহেদী আহমেদ আনসারীর তথ্যমতে, ভূমিকম্পের রিটার্ন পিরিয়ড ধরা হয় ১৫০-২৫০ বছর। ১৭৬২ সালে আরাকান ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে আট মাত্রার একটি ভূমিকম্প হয়েছিল, সাইকেল হিসেবে সেটি এখনো ফিরে আসেনি। এরপর ১৮৮৫ সালে একটি ভূমিকম্প হয়েছিল (মধুপুর ফল্ট ভূমিকম্প, যা বেঙ্গল ভূমিকম্প নামে পরিচিত)। এরকম ১৫০-২৫০ বছরের যে সাইকেল আছে, সেটি কখন হবে তা কেউ জানে না। শুক্রবার, ২১ নভেম্বর ২০২৫ সালের সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে নরসিংদীর মাধবদীতে রিখটার স্কেলে ৫.৭ মাত্রার একটি ভূমিকম্প অনুভূত হয়, যা রাজধানী ঢাকাসহ আশপাশের জেলা পর্যন্ত কেঁপে ওঠে। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (USGS)-এর তথ্য অনুযায়ী এটি ৫.৫ মাত্রার। ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ভূস্তরের ১০ কিলোমিটার গভীরে। দেশের তীব্র ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলা ও সিলেটের জৈন্তাপুর এলাকা। সব এলাকাই ঢাকা থেকে কমপক্ষে ১০০ কিলোমিটারের মধ্যে। সেখানে সাত থেকে আট মাত্রার ভূমিকম্প হলে তা ঢাকার জন্য বড় ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে। ঢাকার ভূমি বিভিন্ন প্রকারের নরম মাটি দিয়ে তৈরি হয়েছে। শহরটির সম্প্রসারিত অংশে জলাশয় ভরাট করে গড়ে তোলা হয়েছে আবাসন এলাকা। ভূমিকম্পের সময় নরম মাটি ও ভরাট করা এলাকার মাটি ভূমিকম্পের কম্পনের মাত্রাকে বাড়িয়ে দেয় এবং মাটি লিকুইফাইড হয়ে যেতে পারে। ফলে ভূমিকম্পে ক্ষতির প্রভাব আরো বাড়িয়ে দিতে পারে। ঢাকা শহরের ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে মাটির গুণাগুণ বিশ্লেষণ করে দক্ষ জিওটেকনিক্যাল ও স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে 'বাংলাদেশ বিল্ডিং কোড' মেনে নির্মাণ করা দরকার।

> যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লেমন্ট ডোহের্টি আর্থ অবজারভেটরি ভূতাত্ত্বিকের এক গবেষণায় জানা গেছে, বাংলাদেশের নিচে টেকটোনিক প্লেটের চাপ জমে উঠছে কম করে হলেও গত ৪০০ বছর ধরে। এ চাপ যখন মুক্ত হবে, তখন সৃষ্ট ভূমিকম্পের মাত্রা দাঁড়াতে পারে ৮.২ রিখটার। এমনকি তা রিখটার স্কেলে ৯ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে

সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্প একটি সাধারণ প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া হলেও তার তীব্রতা ও উৎপত্তি স্থানের ওপর নির্ভর করে প্রভাব অপ্রত্যাশিত হতে পারে। রাজধানীতে প্রায় ২১ লাখ ভবন রয়েছে, যার মধ্যে ৬ লাখ ভবন ছয় তলা বা তার বেশি। ভূমিকম্প হলে এই ৬ লাখ উচ্চতাভিত্তিক ভবন সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ হবে। ভূতাত্ত্বিকদের মতে, বড় ভূমিকম্পগুলো ১৫০-২৫০ বছরের মধ্যে ফের আসে। তাই সাত মাত্রার বড় ভূমিকম্পের সময় এখন এসেছে। নরসিংদী ভূমিকম্পের সময় ছাদ, বৈদ্যুতিক লাইন এবং হালকা দেওয়ালসহ অনেক অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভূমিকম্পের সময় মানুষকে সুরক্ষিত রাখতে টেবিল বা চেয়ারের নিচে আশ্রয় নেওয়া সবচেয়ে কার্যকর। বৈদ্যুতিক লাইনের কাছাকাছি না থাকা, খোলা বা ঝুঁকিপূর্ণ কাঠামোর বাইরে থাকা জরুরি। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, অফিস বা বাসায় শিশু, বৃদ্ধ ও অক্ষমদের জন্য এই প্রস্তুতি প্রয়োজনীয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে; যেমন—জাপান, চিলি ও ক্যালিফোর্নিয়ায় ভূমিকম্প মোকাবিলার জন্য দীর্ঘমেয়াদি প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। জাপানে ভূমিকম্প সচেতনতা শিক্ষা স্কুল স্তর থেকে শুরু হয়। নিয়মিত মহড়া, নিরাপদ আশ্রয়স্থান নির্ধারণ এবং জরুরি পরিকল্পনা এই দেশগুলোর নাগরিকদের জীবনের সুরক্ষা নিশ্চিত করে। বাংলাদেশেও একই ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক সচেতনতা এবং মহড়া প্রয়োজন। সরকারের দায়িত্ব হলো জরুরি অবস্থা পরিকল্পনা তৈরি করা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাহিনী সক্ষম করা এবং জনগণকে প্রশিক্ষিত করা।

নরসিংদী ভূমিকম্প আমাদেরকে দেখিয়েছে যে, যদিও মাত্রা ৫.৫ ছিল, তবু প্রভাব উল্লেখযোগ্য। মানুষের আতঙ্ক, অবকাঠামোর ক্ষয়, বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের ব্যাঘাত স্পষ্ট। এই ভূমিকম্প আমাদের সতর্ক করছে যে, বড় ভূমিকম্পের জন্য প্রস্তুতি অপরিহার্য। ভবিষ্যতের জন্য পরিবার, বিদ্যালয়, অফিস এবং শহর পরিকল্পনায় ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করা, উচ্চতাভিত্তিক ভবনের মান যাচাই এবং নিরাপদ আশ্রয়স্থানের ব্যাবস্থা করা আবশ্যক।

সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশের মাটি ও ভূতাত্ত্বিক কাঠামোর কারণে একটি ৬.০ বা তার বেশি মাত্রার ভূমিকম্পে ঢাকার অধিকাংশ পুরান ভবন, শিল্পকারখানা এবং স্কুল-কলেজগুলো গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, ভবন নির্মাণে সঠিক মান অনুসরণ না করলে, ভবিষ্যতে আরো বড় বিপর্যয় ঘটতে পারে। জনসচেতনতা বৃদ্ধি, নিয়মিত মহড়া এবং জরুরি প্রস্তুতি এখন সময়ের দাবি। অতএব, নরসিংদী ভূমিকম্প শুধু স্থানীয় একটি ঘটনা নয়, এটি সমগ্র দেশের জন্য একটি সতর্কবার্তা। স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, অফিস, পরিবার সব স্তরে জরুরি পরিকল্পনা, সচেতনতা এবং নিরাপদ অবকাঠামোর গুরুত্ব অপরিসীম। টেবিল-চেয়ারের নিচে আশ্রয় নেওয়া, শক্তিশালী beam-column-এর পাশে থাকা, বৈদ্যুতিক লাইনের থেকে দূরে থাকা, এবং আতঙ্কে দৌড়ে বের না হওয়া—এগুলো মৌলিক প্রস্তুতি। বিশ্বমানের উদাহরণ অনুসরণ করে বাংলাদেশও একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প প্রস্তুতি ব্যবস্থা গঠন করতে পারে।

নিশ্চিত করতে হবে যে, জনগণ এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পর্যায়ে সচেতনতা বাড়ানো হচ্ছে। সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোকে নিয়মিত মহড়া, প্রশিক্ষণ এবং জরুরি পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। নরসিংদী ভূমিকম্প আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছে যে, প্রকৃতি কখনো পূর্বাভাস ছাড়া আক্রমণ করতে পারে। তাই শিক্ষা, সচেতনতা ও প্রস্তুতি হলো নিরাপদ জীবনের চাবিকাঠি।

● লেখক : জিওটেকনিক্যাল স্পেশালিস্ট, লুইজিয়ানা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
অনুলিখন : এম এ খালেক

CamScanner

ভূমিকম্প ও বাংলাদেশের অর্থনীতি

মোহাম্মদ আবদুল মজিদ

রিখটার স্কেলে বর্তমানের ৫.৭ স্কেলের পরিবর্তে ৭-৮ স্কেলের সম্ভাব্য উচ্চমাত্রার ভূমিকম্প হলে বাংলাদেশ অর্থনীতিতে কী প্রভাব পড়বে তার আগাম হিসাব-নিকাশ তুলে ধরে যেভাবে ভয় ধরানো হচ্ছে তাতে গত ২১ তারিখের মধ্যম প্রকৃতির ভূমিকম্পটির দ্বারা ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ও সে ব্যাপারে করণীয়সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা, কর্মপরিকল্পনা উবে যাচ্ছে। এটা ঠিক যে, ভূমিকম্প অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের তুলনায় সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত, সবচেয়ে দ্রুত এবং সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক বলেই বাংলাদেশে অন্য সব দুর্যোগের তুলনায় ভিন্ন বৈশিষ্ট্য, তীব্রতা ও ঝুঁকি বহন করে। ঘূর্ণিঝড় বা বন্যার মতো আগাম প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ কম থাকায় ভূমিকম্পের ক্ষতি প্রতিরোধ পুরোপুরি করা যায় না, কমানো যায়। সে কারণে আগাম আশঙ্কায় বর্তমানের বিদ্যায়তন পরীক্ষা বন্ধ করা, রাজধানী শহর থেকে সরে পড়া সবই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অর্থনীতির জন্য দুঃসংবাদ বয়ে আনবে।

বাংলাদেশ ভৌগোলিক কারণে পৃথিবীর অন্যতম ভূমিকম্প ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে অবস্থিত। ভারতীয়, বার্মিজ ও ইউরেশীয় টেকটোনিক প্লেটের সংযোগস্থলের কাছে অবস্থান করায় এখানে মাঝারি থেকে বড় মাত্রার ভূমিকম্পের আশঙ্কা প্রবল। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান ও গবেষণা বলছে, ঝুঁকির মাত্রা বাস্তব এবং বড় ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা অত্যন্ত বেশি। বড় মাত্রার ভূমিকম্প হলে দেশে ৩৪৪ বিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ সম্পদ ক্ষতির মুখে পড়তে পারে বলে আন্তর্জাতিক এক গবেষণায় উঠে এসেছে। সারা দেশে ঝুঁকির মুখে থাকা ভবন প্রতিস্থাপনে ব্যয় হতে পারে ৩৫৬ বিলিয়ন ডলার, যা দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৭৭ শতাংশ।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের (বিএমডি) তথ্য অনুযায়ী, গত এক শতকে দেশে অন্তত ২০০টিরও বেশি ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বড় ধরনের ভূমিকম্প রেকর্ড করা হয়েছে। বছরে গড়ে ২৫ থেকে ৩০টি ক্ষুদ্র ভূমিকম্প অনুভূত হচ্ছে, যার বড় অংশ সিলেট, চট্টগ্রাম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে। আন্তর্জাতিক সংস্থা জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি-জাইকার এক গবেষণা অনুযায়ী, ঢাকায় ম্যাগনিচিউড ৭.৫ মাত্রার ভূমিকম্পে ৭০ শতাংশ ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, দুই লাখের বেশি মানুষের প্রাণহানি ঘটতে পারে এবং সামগ্রিক ক্ষতি হতে পারে ৩০ থেকে ৫০ বিলিয়ন ডলার। ঢাকা বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এবং পরিকল্পনাহীনভাবে বেড়ে ওঠা নগরগুলোর একটি হওয়ায় ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি বহুগুণ বাড়তে পারে।

একটি বড় ধরনের ভূমিকম্পে আর্থিক ক্ষতি হবে বহুমাত্রিক- অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ তিন থেকে পাঁচ ট্রিলিয়ন টাকা (৩০ থেকে ৫০ বিলিয়ন ডলার) ছাড়াতে পারে। অবকাঠামোগত ক্ষতি; সেতু, রাস্তা, ভবন, ফ্লাইওভার, এক্সপ্রেসওয়ে, মেট্রোরেল (ওপরে হোক আর পাতালে হোক), হাসপাতাল, স্কুল- সব মিলিয়ে হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদ ঝুঁকিতে। বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি সরবরাহ বিঘ্নিত হলে নগরজীবন অচল হয়ে পড়তে পারে। ঢাকা ও চট্টগ্রাম দেশের মোট অর্থনৈতিক উৎপাদনের প্রায় ৬০ শতাংশ বহন করে, গার্মেন্ট ও শিল্পাঞ্চলে উৎপাদন বন্ধ হলে রপ্তানি খাতে মারাত্মক আঘাত আসবে। আর্থিক ও ব্যাংকিং খাত ঝুঁকিগ্রস্ত হতে পারে। ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের ঋণ শোধে অক্ষমতা বাড়লে নন-পারফরমিং লোন বা খেলাপি ঋণ বৃদ্ধি পাবে। বীমা কোম্পানিগুলোর সক্ষমতা দুর্বল হওয়ায় বড় ক্ষতি সামাল দিতে তারা অক্ষম হয়ে পড়তে পারে।

ভূমিকম্প প্রতিরোধ নয়, ক্ষয়ক্ষতি কমানোই প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। এখানে শুধু সরকার নয়, সবারই দায়িত্ব রয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড অনুসরণ বাধ্যতামূলক করা এবং রাজউক, সিটি করপোরেশন ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সুষম মনিটরিং নিশ্চিত করা জরুরি। পুরনো স্কুল, হাসপাতাল ও আবাসিক ভবনগুলো পুনর্মূল্যায়ন করে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের তালিকা ও রেট্রোফিটিং করা। দেশে আরও সিসমিক স্টেশন, ভূ-প্রযুক্তি গবেষণাগার ও আঞ্চলিক মনিটরিং সিস্টেম প্রয়োজন। ফায়ার সার্ভিস, সেনাবাহিনী, পুলিশ ও সিভিল ডিফেন্সকে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ ও আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে শক্তিশালী করা উচিত হবে। স্কুল ও অফিসে নিয়মিত ভূমিকম্প মহড়া বাধ্যতামূলক করা উচিত। মিডিয়া ও সরকারি প্রচারণার মাধ্যমে জনগণকে প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন।

স্বয়ং রিয়েল এস্টেট খাত ভূমিকম্পজনিত ঝুঁকি কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বিএনবিসি বা বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড অনুসারে ভূমিকম্প সহনীয় নকশা, সঠিক ভিত্তি ও মানসম্মত ইট-সিমেন্ট-রড ব্যবহারের বিকল্প নেই। ঢাকার মতো নরম মাটিতে নির্মাণের আগে সঠিক সয়েল টেস্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাজের মান নিশ্চিত করতে প্রকৌশলী ও তদারককারীর উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। স্ট্রাকচারাল ডিজাইন ও ব্যবহৃত উপকরণের প্রমাণ ক্রেতাকে জানানো রিয়েল এস্টেট কোম্পানির নৈতিক দায়িত্ব।

সন্দেহ নেই ভূমিকম্প বাংলাদেশের জন্য বাস্তব ও গুরুতর হুমকি, এটি কোনো অনুমান নয়, বৈজ্ঞানিক সতর্কতা। তবে ক্ষয়ক্ষতি কমানোর সুযোগ সব সময় বিদ্যমান। জাপান পৃথিবীর সবচেয়ে ভূমিকম্পপ্রবণ দেশগুলোর একটি হওয়ায়, সেখানে ভূমিকম্প মোকাবিলায় অত্যন্ত উন্নত ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। জাপান যে প্রধান পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করেছে, তা হলো উন্নত বিল্ডিং কোড ও ভূমিকম্প সহনশীল নির্মাণ, উন্নত ভূকম্পন পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা, শিক্ষা-মহড়া ও জনসচেতনতা, উন্নত গবেষণা ও প্রযুক্তি, সুনামি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, নগর পরিকল্পনায় দুর্যোগ সহনশীলতা ও জরুরি সাড়া ও পুনর্বাসন ব্যবস্থা। জাপানের ভূমিকম্প মোকাবিলা ব্যবস্থা বিশ্বে সবচেয়ে উন্নত, কারণ সেখানে বৈজ্ঞানিক গবেষণা, কঠোর বিল্ডিং কোড, প্রযুক্তি, জনসচেতনতা ও জরুরি সাড়া ব্যবস্থা- সবই সমন্বিতভাবে কাজ করে। বাংলাদেশ যদি একই ধরনের নীতি, প্রযুক্তি ও সচেতনতা গ্রহণ করতে পারে, তাহলে একটি বড় ভূমিকম্পের সম্ভাব্য ক্ষতি অর্ধেকে নেমে আসতে পারে। বাংলাদেশকে এখনই সিদ্ধান্ত নিতে হবে প্রস্তুত হয়ে বাঁচবে, নাকি উদাসীনতায় বারবার বড় বিপর্যয়ের মুখোমুখি হবে। ঝুঁকিতে থাকা ভবন খুঁজে বের করে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা না নেওয়া হলে বড় ধরনের মানবিক ও আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির মুখোমুখি হতে পারে বাংলাদেশ।

২০২৩ সালে 'ভূমিকম্পে দুর্বলতা ও বাংলাদেশে পদ্ধতিগত ঝুঁকি মূল্যায়ন' শীর্ষক একটি অন্তর্বর্তীকালীন গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে ইতালির গ্লোবাল আর্থকোয়াক মডেলিং (জেম) ফাউন্ডেশন। প্রতিবেদনে বাংলাদেশ ও এর চারপাশের সক্রিয় ফল্ট জোন থেকে উদ্ভূত ভূমিকম্পের ঝুঁকির মুখে দেশে বিরাজমান বড় ধরনের দুর্বলতার বিষয়টি তুলে ধরা হয়। ওই প্রতিবেদনে সম্পদের ঝুঁকির ক্ষেত্রে আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্পসম্পদের ভৌগোলিক অবস্থান ও মূল্য বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে দেশের সাতটি অঞ্চলের সম্পদের (ভবন) সংখ্যা ধরা হয়েছে ২ কোটি ৯০ লাখ। ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে থাকা এ সম্পদের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে সর্বোচ্চ ৩৪৪ বিলিয়ন ডলার, যা ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপির ৭৪ শতাংশ। ভূমিকম্পের ক্ষতি থেকে এ সম্পদ রক্ষা করতে প্রতিস্থাপন ব্যয় ধরা হয়েছে ৩৫ হাজার ৬০০ কোটি ডলার। ঢাকা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে সম্পদের পরিমাণ ও প্রতিস্থাপন ব্যয় হবে সবচেয়ে বেশি। এর মধ্যে ঢাকার ৯০ লাখ ভবন প্রতিস্থাপনে ১৪ হাজার ৯০০ কোটি ডলার। চট্টগ্রামে ৫০ লাখ ভবন প্রতিস্থাপনে ব্যয় হবে ৬ হাজার ২০০ কোটি ডলার। রাজশাহীতে ৪০ লাখ ভবন প্রতিস্থাপনে ৪২ বিলিয়ন ডলার ও খুলনার ৩০ লাখ ভবন প্রতিস্থাপনে ব্যয় হবে ৩৪ বিলিয়ন ডলার। রংপুরের ৪০ লাখ ভবনের ক্ষেত্রে খরচ হবে ৩৪ বিলিয়ন ডলার। বরিশাল ও সিলেটের ২০ লাখ করে ভবন প্রতিস্থাপনে ব্যয় হবে ১৭ বিলিয়ন ডলার করে।

স্বাভাবিকভাবেই বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, শুক্রবার রিখটার স্কেলে ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্পে ঢাকা শহরের যত স্থাপনায় ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, ভবন দেবে গেছে, ফাটল হয়েছে তার তুলনায় ৭ মাত্রার হলে ক্ষয়ক্ষতি অনেক গুণ বেড়ে যাবে। অনেক ভবন ভেঙে পড়া, বহু মানুষ হতাহত হওয়ার ঝুঁকি থাকবে। ঢাকার ১০০ কিলোমিটারের মধ্যে এমন ভূমিকম্প হলে দুই-তিন লাখ মানুষ হতাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, ভেঙে পড়তে পারে ঢাকা শহরের ৩৫ শতাংশ ভবনও।

ক্ষয়ক্ষতি কমানোই প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। এখানে শুধু সরকার নয়, সবারই দায়িত্ব রয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড অনুসরণ বাধ্যতামূলক করা এবং রাজউক, সিটি করপোরেশন ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সুষম মনিটরিং নিশ্চিত করা জরুরি

ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ : উন্নয়ন অর্থনীতির বিশ্লেষক

মতামত লেখকের নিজস্ব

CamScanner

শেয়ার বিজ

ডিজিটাল বাংলাদেশ কি নতুন বৈষম্য তৈরি করছে?

ড. মতিউর রহমান

আমরা একটি নিম্ন আয়ের দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের পথে দ্রুত অগ্রসরমাণ। কিন্তু এই আপাতদৃষ্টিতে ঝলমলে অর্জনের আড়ালে অত্যন্ত জটিল এক অসাম্যের জাল লুকিয়ে আছে, যা এখন ডিজিটাল রূপান্তরের শক্তিশালী তরঙ্গের মাধ্যমে আরও দৃঢ়, সূক্ষ্ম এবং জটিল আকার ধারণ করেছে

বাংলাদেশকে বিশ্বমঞ্চে প্রায়ই এক বিশিষ্ট উন্নয়ন সাফল্যের গল্প হিসেবে পরিচিত করা হয়। তৈরি পোশাক রপ্তানি, প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সের বিপুল প্রবাহ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (আইটি) দ্রুত বিস্তার এবং মোবাইল-ভিত্তিক ডিজিটাল অর্থায়নের মতো ক্ষেত্রগুলোতে দেশের যে উল্লম্ফন ঘটেছে, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। আমরা একটি নিম্ন আয়ের দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের পথে দ্রুত অগ্রসরমান। কিন্তু এই আপাতদৃষ্টিতে ঝলমলে অর্জনের আড়ালে অত্যন্ত জটিল এক অসাম্যের জাল লুকিয়ে আছে, যা এখন ডিজিটাল রূপান্তরের শক্তিশালী তরঙ্গের মাধ্যমে আরও দৃঢ়, সূক্ষ্ম এবং জটিল আকার ধারণ করেছে। আমাদের উন্নয়ন বিতর্কে এখন কেবল অর্থনৈতিক পুঁজির বণ্টন নিয়ে আলোচনা করলেই চলবে না; জ্ঞান, ক্ষমতা ও ধারণা নিয়ন্ত্রণের মতো গভীর সামাজিক-জ্ঞানতাত্ত্বিক (socio-epistemic) কাঠামোগত অসাম্য নিয়ে কথা বলতে হবে। ২০২৫ সালে বলিভিয়ার সমাজবিজ্ঞানী ও ডেটা বিজ্ঞানী রিকার্ডো আলোনজো ফার্নান্দেজ সালগুয়েরো (Ricardo Alonzo Fernández Salguero) তার প্রবন্ধ A Synthetic Theory of Socio-Epistemic Structuration: Capital, Ideology, and Agency in the Age of Digital Inequality' যে প্রস্তাব দিয়েছেন, তা বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি বোঝার জন্য এক অপরিহার্য দিকনির্দেশক। এই তত্ত্ব আমাদের দেখায় যে ডিজিটাল যুগে সামাজিক অসাম্য কীভাবে কেবল পুনঃপ্রতিষ্ঠিতই হয় না, বরং এক নতুন রূপে সংজ্ঞায়িত হয়। বাংলাদেশে যেখানে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ডিজিটাইজেশনের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে, সেখানে সালগুয়েরোর তত্ত্ব আমাদের সতর্ক করে দিয়ে বোঝায় যে, কেবল বস্তুগত পুঁজিই (Material Capital), যেমন- অর্থ, জমি, বা প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম অসাম্য ব্যাখ্যা করতে পারে না। বরং জ্ঞান ও ধারণার কাঠামো, অর্থাৎ —ideologies বা আদর্শিক ন্যারেটিভ, প্রযুক্তিগত 'narratives' এবং ডিজিটাল 'knowledge hierarchies'- একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সালগুয়েরোর তত্ত্বে এই মৌলিক ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত যে অসাম্য এখন কেবল সম্পদ বা অর্থনৈতিক পুঁজির অভাবে সৃষ্ট হয় না; এর শেকড় আরও গভীরে প্রোথিত। প্রথাগত সমাজ বিশ্লেষণ, যেমন চিরায়ত মার্কসীয় শ্রেণি বিশ্লেষণ, মূলত বস্তুগত কাঠামো জমি, মূলধন, শ্রম, বা শিল্প পুঁজিকে সমাজের প্রধান সূচক হিসেবে দেখে এসেছে। কিন্তু ডিজিটাল যুগে এসে সেই বিশ্লেষণের সঙ্গে একটি নতুন এবং অত্যন্ত প্রভাবশালী মাত্রা যুক্ত হয়েছে, যা হলো জ্ঞানাত্মক কাঠামো (Epistemic Structures)। এই কাঠামো বলতে বোঝায় প্রধান ধারণা বা ডমিন্যান্ট আইডিয়া, অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং সেই অদৃশ্য নেটওয়ার্ক যেখানে একজন ব্যক্তিকে যোগ্য, বিশেষজ্ঞ বা প্রভাবশালী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। বাংলাদেশে আমরা এই জ্ঞানাত্মক কাঠামোর প্রভাব দেখতে পাই ঢাকা ও চট্টগ্রামের ফিনটেক হাব থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত গ্রামীণ মোবাইল ব্যাংকিংসেবা এবং বিভিন্ন সরকারি আইসিটি-ভিত্তিক সেবার ব্যবহারে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির স্তম্ভ তৈরি পোশাক খাতকে এই নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা যাক, যা একই সঙ্গে বিশাল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও তীব্র সামাজিক উত্তেজনার ক্ষেত্রও। লাখ লাখ গ্রামীণ নারী একটি উন্নত জীবনের আশায় ঢাকা, চট্টগ্রাম, বা নারায়ণগঞ্জের শিল্পাঞ্চলগুলোয় এসে ফ্যাক্টরিতে কাজ করতে বাধ্য হয়। তারা জাতীয় রপ্তানিতে বিশাল অবদান রাখছে, কিন্তু তাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের ডিজিটাল দক্ষতা অত্যন্ত সীমিত। তাদের অনেকের হাতেই স্মার্টফোন থাকলেও, তারা এই প্রযুক্তিকে কেবল যোগাযোগ বা সীমিত বিনোদনের বাইরে ব্যবহার করে আর্থিক বা সামাজিক উত্থানের পথে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে না। সালগুয়েরোর ভাষায়, এই পরিস্থিতি হলো একটি socios-epistemic structuration-এর ব্যর্থতা। যেখানে বস্তুগত অংশগ্রহণ (যেমন-একটি নিশ্চিত চাকরি ও নিয়মিত মজুরি) নিশ্চিত হয়েছে, কিন্তু জ্ঞানগত দিক- অর্থাৎ ডিজিটাল দক্ষতা, কৌশলগত নেটওয়ার্কের প্রবেশাধিকার এবং সফলতার ন্যারেটিভ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা- তাদের সামাজিক উত্তরণের পথে বিশাল প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করছে। তাদের কাছে প্রযুক্তি আছে, কিন্তু এটিকে কৌশলগতভাবে ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও ক্ষমতার অভাব রয়েছে। এর বিপরীতে, নগর মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত তরুণ সম্প্রদায়, যারা সরাসরি ICT এবং ফিনটেক খাতে কর্মরত, তারা এক প্রকার দ্বৈত পুঁজির অধিকারী। তারা একই সাথে বস্তুগত পুঁজি (উচ্চ বেতন, নগরীর সুযোগ-সুবিধা) এবং জ্ঞানাত্মক পুঁজি (আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কে প্রবেশাধিকার, ইংরেজি ভাষা ও অত্যাধুনিক ডিজিটাল দক্ষতা) দুটোই ধারণ করে। তাদের এই সক্ষমতা (agenc) তাদের শুধু ব্যক্তিগত উন্নতিই ঘটায় না, বরং তাদের প্রতিষ্ঠান, সরকারি নীতি এবং বাজারের গতিপ্রকৃতিতে সরাসরি প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম করে তোলে। এই ক্ষেত্রে, ডিজিটাল অসাম্য কেবল প্রযুক্তি বা যন্ত্রপাতির অপ্রতুলতা নয়; এটি সামাজিক ও জ্ঞানাত্মক কাঠামোর একটি সুসংগঠিত ফল, যা এক গোষ্ঠীকে সুবিধা দেয় এবং অন্যকে প্রান্তিক করে রাখে।

বাংলাদেশের শিক্ষা ক্ষেত্র এই অসাম্যকে আরও প্রখরভাবে বাড়িয়ে তুলছে। ইংরেজি-মাধ্যমিক এবং বেসরকারি শহুরে স্কুলগুলোর শিক্ষার্থীরা এবং গ্রামীণ বা সরকারি স্কুলগুলোর শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য, তা কেবল শিক্ষার মানদণ্ডেই নয়, বরং জ্ঞানাত্মক মূলধন (Epistemic Capital) অর্জনের ক্ষেত্রেও স্পষ্ট। শহুরে সন্তানরা শৈশব থেকেই বিশ্বব্যাপী মিডিয়া, ইংরেজি ভাষা এবং অত্যাধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে অতি সহজে এই জ্ঞানাত্মক পুঁজি অর্জন করে। কিন্তু গ্রামীণ বা নিম্ন আয়ের পরিবারে জন্মানো শিশুরা এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়, ফলে ভবিষ্যতে তাদের আর্থিক ও সামাজিক স্বীকৃতি বহুলাংশে সীমিত হয়ে পড়ে। আন্তর্জাতিক বা স্থানীয় অনলাইন ফ্রিল্যান্সিং, ডিজিটাল উদ্যোক্তা হওয়া এবং গ্লোবাল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্মে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ মূলত তাদের জন্য দুর্গম হয়ে ওঠে। এই জ্ঞানাত্মক বিভাজন শিক্ষা থেকে কর্মজীবনে একটি অদৃশ্য দেয়াল তৈরি করছে।

ডিজিটাল অর্থায়ন (Digital Finance) এই অসাম্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশে বিকাশ (bKash), নগদ (Nagad), রকেট (Rocket)-এর মতো মোবাইল ব্যাংকিংসেবা প্রায় প্রতিটি গ্রামীণ পরিবারে পৌঁছে গেছে এবং এটি একটি বিরাট সাফল্য। কিন্তু কেবল প্রযুক্তিতে অ্যাকসেস বা প্রবেশাধিকার যথেষ্ট নয়। শিক্ষিত এবং প্রযুক্তি-সচেতন পরিবারগুলো এই সেবা ব্যবহার করে সঞ্চয়, ক্ষুদ্র বিনিয়োগ এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদের বৃদ্ধি করতে পারে। অন্যদিকে কম শিক্ষিত গ্রামীণ ব্যবহারকারীরা এটিকে কেবল লেনদেন বা রেমিট্যান্স গ্রহণের জন্য সীমাবদ্ধ রাখে। তাদের মধ্যে এই সেবাগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে সঞ্চয় বা দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের কৌশলগত জ্ঞান ও দক্ষতা কম। ফলস্বরূপ, ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি যখন জ্ঞানাত্মক কাঠামোর মধ্য দিয়ে যায়, তখন তা বিদ্যমান অর্থনৈতিক অসাম্যকে নতুন মোড়কে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে দেয়— যেটি Salguero-এর মূল যুক্তি।

এই অসাম্যকে আরও দৃঢ় করছে আদর্শিকতা ও ন্যারেটিভের (Ideology and Narratives) নিয়ন্ত্রণ। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বা 'স্মার্ট বাংলাদেশ' ন্যারেটিভ যা নিঃসন্দেহে একটি অগ্রগতির প্রতীক— তা মূলত শহরের শিক্ষিত, তরুণ উদ্যোক্তা এবং আইসিটি খাতের সফলতার ওপর অতিরিক্ত জোর দেয়। ফলে নিম্ন আয়ের গ্রামীণ শ্রমিক, কৃষক, বা প্রান্তিক নারীর সংগ্রাম, অবদান এবং ডিজিটাল বঞ্চনার অভিজ্ঞতা দৃশ্যত অদৃশ্য হয়ে যায়। এটি সমাজে একটি শক্তিশালী epistemic hierarchy সৃষ্টি করে, যা শিক্ষিত শহুরে শ্রেণিকে বৈধতা দেয় এবং তাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রাধান্য নিশ্চিত করে। এই ন্যারেটিভের কারণে, যারা ডিজিটাল সংযোগ থেকে বঞ্চিত, তাদের পিছিয়ে থাকাকে ব্যক্তিগত ব্যর্থতা হিসেবে দেখা হয়, কাঠামোগত অসাম্য হিসেবে নয়।

ডিজিটাল শ্রমবাজার, অর্থাৎ গিগ ইকোনমি, আরও পরিষ্কারভাবে এই বৈষম্য প্রদর্শন করে। Upwork, Fiverr এবং স্থানীয় ফ্রিল্যান্সিং প্ল্যাটফর্মে অংশগ্রহণের সুযোগ সবার জন্য উন্মুক্ত হলেও, যারা সাবলীলভাবে ইংরেজি জানে, আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে প্রযুক্তিতে দক্ষ এবং গ্লোবাল কাজের অভিজ্ঞতা রাখে, তারাই উচ্চ-দামের, উচ্চ-দক্ষতার কাজগুলো দখল করে। অন্যদিকে অন্যরা কম দামের, নিম্ন-দক্ষ কাজের জন্য সীমাবদ্ধ থাকে। এখানে কেবল যন্ত্র, ইন্টারনেট, বা মোবাইল থাকা যথেষ্ট নয়; বরং এই প্রযুক্তির মাধ্যমে কৌশলগত কাজ করার 'agency' বা ক্ষমতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লিঙ্গগত দিকও এই অসাম্যকে আরও জটিল করে তুলেছে। লাখ লাখ নারী তৈরি পোশাক, গৃহসেবা, এবং অন্যান্য অপ্রাতিষ্ঠানিক সেবা খাতে জাতীয় অর্থনীতিতে বিশাল অবদান রাখলেও, ডিজিটাল খাতে তাদের অংশগ্রহণ এখনও সীমিত। এর প্রধান কারণ হলো পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক নিয়ম, প্রযুক্তির প্রতি কম অ্যাকসেস এবং উচ্চতর শিক্ষায় সীমিত প্রবেশাধিকার। যদিও শহুরে মধ্যবিত্ত নারী উচ্চমূল্যের ডিজিটাল খাতে প্রবেশ করছে এবং সফল হচ্ছে, গ্রামীণ নারীর অবস্থান মূলত সীমিতই থাকছে। ফলে লিঙ্গ, আয়, শিক্ষা ও শহর-গ্রামের অবস্থানের ভিত্তিতে এক layered hierarchy বা স্তরবদ্ধ সামাজিক কাঠামো তৈরি হচ্ছে।

শহর-গ্রাম অভিবাসন (Rural-Urban Migration) এই অসাম্যকে আরও গভীর করে তোলে। গ্রামীণ অঞ্চল থেকে শহরে আসা অভিবাসীরা নগরের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ শ্রম যোগ করে, কিন্তু তাদের 'epistemic capital' প্রায়ই কম থাকে। তারা অনলাইন শিক্ষা, ডিজিটাল ব্যাংকিংয়ের কৌশলগত ব্যবহার, বা পেশাগত নেটওয়ার্ক থেকে বঞ্চিত হয়। তারা নিম্ন-মানের, অনিয়মিত চাকরিতে যুক্ত থাকে, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করে এবং সীমিত সামাজিক নেটওয়ার্কের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তাই বাংলাদেশে ডিজিটাল অসাম্য কেবল প্রযুক্তিগত সরঞ্জামাদির অভাব নয়, বরং জ্ঞান, ক্ষমতা, এবং 'agency'-এর অসম বণ্টন। সালগুয়েরো অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে দেখিয়েছেন যে অসাম্য একটি পুনরাবৃত্তিমূলক প্রক্রিয়া। যাদের বস্তুগত ও জ্ঞানাত্মক পুঁজি দুটোই আছে, তারা এমন কাঠামো তৈরি করে যা প্রাকৃতিকভাবেই তাদের সুবিধা ধরে রাখে। বাংলাদেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চমানের শহুরে স্কুল, ইনকিউবেটর এবং করপোরেট নেটওয়ার্কগুলো এই পুনরাবৃত্তিমূলক প্রক্রিয়াটিকেই শক্তিশালী করছে। এই কাঠামোই সমাজের 'সফলতার গল্পের' নিয়ম নির্ধারণ করে দেয় এবং অন্যদের পথে থাকা প্রতিবন্ধকতাগুলোকে অদৃশ্য করে দেয়।

বাংলাদেশ বর্তমানে ডিজিটাইজেশনের এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। অর্থনৈতিক অগ্রগতি দৃশ্যমান হলেও, দ্রুত ও সচেতন নীতি-নির্ধারক পদক্ষেপ না নেয়া হলে এই প্রযুক্তিগত রূপান্তর কেবল বিদ্যমান অসাম্যকেই বাড়িয়ে দেবে। এই অসাম্য দূরীকরণের জন্য সালগুয়েরোর 'socio-epistemic' কাঠামো অনুসারে উন্নয়নকে কেবল সংযোগ বা আর্থিক বৃদ্ধি হিসেবে না দেখে, বরং জ্ঞান, ক্ষমতা ও ধারণা নিয়ন্ত্রণের সমন্বিত প্রক্রিয়া হিসেবে দেখতে হবে।

এর জন্য জরুরি হলো জ্ঞানাত্মক শিক্ষার বিস্তৃতি কোডিং, ডেটা ম্যানেজমেন্ট এবং অনলাইন আর্থিক দক্ষতাকে গ্রামীণ ও নগর উভয় অঞ্চলের স্কুলে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা। সাধারণ ডিজিটাল লিটারেসি নয়, কৌশলগত ব্যবহার শেখানোই গুরুত্বপূর্ণ। একইসঙ্গে, পিতৃতান্ত্রিক বাধা ভাঙতে নারী অন্তর্ভুক্তি ও সক্ষমতা বাড়াতে হবে এবং গ্রামীণ ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সম্প্রদায়ের জ্ঞানাত্মক পুঁজি বাড়াতে অনলাইন কো-অপারেটিভ ও স্থানীয় পর্যায়ে ডিজিটাল উদ্ভাবন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক।

টেকসই উন্নয়নের পথে সমাজের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে হলে এখন প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা দূর করে একটি ন্যায্য 'epistemic hierarchy' তৈরি করতে হবে। এই লক্ষ্যে, প্রাইভেট-পাবলিক অংশীদারি জোরদার করে করপোরেট ট্রেনিং ও ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামের মাধ্যমে নিম্ন আয়ের শিক্ষার্থীদের বস্তুগত সুবিধা ও 'epistemic' ক্ষমতা দুটোই এক সঙ্গে সংযুক্ত করা প্রয়োজন। এছাড়া ডিজিটাল বিপ্লবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সংগ্রাম ও সাফল্যকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ডিজিটাল ও গিগ অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা আনতে ডিজিটাল শ্রম সুরক্ষা নিশ্চিত করা অপরিহার্য; যার মধ্যে রয়েছে এই শ্রমিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা জাল, আইনি সুরক্ষা এবং ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করা। এই সমন্বিত পদক্ষেপগুলো কেবল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিই নয়, বরং একটি স্থিতিশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনে সহায়তা করবে।

বাস্তবে এই socio-epistemic বিভাজন দূর করা হবে কিনা, সেই প্রশ্নের উত্তরই নির্ধারণ করবে ডিজিটাল বিপ্লবের লাভ কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠ উর্ধ্ব শ্রেণির জন্য সীমাবদ্ধ থাকবে, নাকি পুরো জাতির জন্য উন্মুক্ত হবে। কেবল ইন্টারনেট সংযোগ বা প্রযুক্তিগত সুবিধা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দেয়াই যথেষ্ট নয়; কারণ এটি বিদ্যমান অসাম্যকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। সত্যিকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের চাবিকাঠি নিহিত রয়েছে কৌশলগত জ্ঞান, উচ্চতর ডিজিটাল দক্ষতা এবং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক ন্যারেটিভের প্রসারের মধ্যে। যখন সমাজের সব স্তরের মানুষ প্রযুক্তিকে কেবল ব্যবহারকারী হিসেবে নয়, বরং জ্ঞান এবং ক্ষমতার নির্মাতা হিসেবে আয়ত্ত করতে পারবে, তখনই বাংলাদেশ একটি টেকসই ও স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে।

গবেষক ও উন্নয়নকর্মী

CamScanner

বিদেশে কর্মী পাঠানোর পদ্ধতি বদলাতে হবে

এ কে এম আতিকুর রহমান

গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য মতে, গত ১১ নভেম্বর দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এক সংবাদ সম্মেলনে জানায় যে মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানোর নামে 'সিন্ডিকেট করে অর্থ আত্মসাৎ ও পাচারের' অভিযোগে চারটি রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এসব এজেন্সি ১৮ হাজার ৫৬৩ জন কর্মীর কাছ থেকে সরকার নির্ধারিত ৭৮ হাজার ৯৯০ টাকার পরিবর্তে 'পাঁচগুণ বেশি অর্থ' আদায় করেছে। তাই চার মামলায় ৩১০ কোটি ৯৩ লাখ ৯৫ হাজার টাকা 'আত্মসাৎ ও পাচারের' অভিযোগ আনা হচ্ছে। মালয়েশিয়াগামী কর্মীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের জন্য এ বছরের মার্চ মাসে ১২টি, সেপ্টেম্বর মাসে ১৩টি রিক্রুটিং এজেন্সির নামে এবং নভেম্বর মাসে ১১ জনের নামে মামলা করেছে দুদক।

এসব মামলা নতুন কিছু নয়, আগেও হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে। তবে ভুক্তভোগী কর্মীরা তাঁদের দেওয়া অতিরিক্ত অর্থ এজেন্সির কাছ থেকে ফেরত পাবেন কি না, তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়।

অভিবাসী কর্মীদের রিক্রুটিং এজেন্সির এই শোষণ শুধু যে মালয়েশিয়ার ক্ষেত্রেই ঘটছে, তেমনটি নয়। এজেন্সিগুলো বাংলাদেশ থেকে বিশ্বের যেকোনো প্রান্তেই কর্মী প্রেরণ করুক না কেন, প্রত্যেক কর্মীর কাছ থেকেই অতিরিক্ত অর্থ আদায় নিয়মিত ব্যাপার।

ওই অর্থের কোনো বৈধ কাগজপত্রও কর্মীদের দেওয়া হয় না। এ ছাড়া রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো সংগত কারণেই ওই অর্থ দেশের কোনো ব্যাংকেও জমা রাখে না। বহু বছর থেকেই এমনটি চলে আসছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে এসব রিক্রুটিং এজেন্সির মালিকরা সরকার ও প্রশাসনের ঘনিষ্ঠ হওয়ায় তাঁদের এই কর্মী শোষণ কার্যক্রম 'ম্যানেজড' হয়ে যায়।

কর্মীরাই চিরদিন শোষণের শিকার হয়ে থাকেন। আর মালয়েশিয়ার ক্ষেত্রে আমাদের এজেন্সিগুলোর, বিশেষ করে নেতৃত্বদানকারী সিন্ডিকেটের এতটাই ক্ষমতা যে দুই প্রান্তেই তাদের স্বার্থ রক্ষার সুব্যবস্থা থাকে।

২০২১ সালের ১৯ ডিসেম্বর বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের উল্লেখ করে খবরে বলা হয়েছে, ওই সময় ২৫ থেকে বাড়িয়ে ১০০ রিক্রুটিং এজেন্সিকে কর্মী প্রেরণের সুযোগ দিলেও সেটি একটি সিন্ডিকেটের নিয়ন্ত্রণেই ছিল। তা ছাড়া সরকারের নির্ধারিত অভিবাসন ব্যয় ৭৮ হাজার ৫৪০ টাকা হলেও একেকজনের গড়ে পাঁচ লাখ টাকা ব্যয় হয়েছে। এর আগে ২০১৬ সালে দুই দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত 'জিটুজি প্লাস' পদ্ধতির কথা বলতে গিয়ে ১০টি নির্ধারিত এজেন্সির সিন্ডিকেটের উল্লেখ করা হয়েছে।

সত্যি বলতে, ওই পদ্ধতির অনুসরণে একজন কর্মীও 'জিটুজি' অনুসরণে যেতে পারেননি, সব কর্মীই গেছেন 'প্লাস'-এর অনুসরণে। পদ্ধতিটির নামের সঙ্গে 'জিটুজি' শব্দটি রাখা হয়েছিল জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য। সম্পূর্ণ নিয়োগপ্রক্রিয়াটির নিয়ন্ত্রণে ছিল 'প্লাস সিন্ডিকেট'-এর ১০টি বাংলাদেশি রিক্রুটিং এজেন্সি, যারা ছিল উভয় দেশের নেতৃত্বের আশীর্বাদপুষ্ট। এভাবে দুই বছর সময়ের মধ্যেই তারা বাংলাদেশের দরিদ্র অভিবাসী কর্মীদের কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছে বিপুল পরিমাণ অর্থ, যার বেশির ভাগই বাংলাদেশ থেকে অবৈধ পথে বের হয়ে গেছে।

বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়ায় কর্মী যাওয়ার সংখ্যা শুরুতে কম হলেও কর্মীরা অনেকটা নিশ্চিন্তেই সেখানে যেতেন। অনেক সময় কর্মীদের বিমানভাড়াও নিয়োগকর্তারা বহন করতেন। কর্মী যাওয়ার সংখ্যা বাড়তে থাকলে তাঁরা স্বার্থান্বেষীদের লোলুপ দৃষ্টির শিকার হন, তাঁদের নানাভাবে শোষণ এবং প্রতারণা শুরু হয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ১৯৯৬ সালের জুলাই মাসে মালয়েশিয়া সরকার বাংলাদেশি কর্মীদের নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। অভ্যন্তরীণ চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে মালয়েশিয়া ২০০০ সালে বিশেষ অনুমোদনের মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিয়োগের অনুমতি দেয়। কর্মীদের নানাভাবে হেনস্তার পরিপ্রেক্ষিতে বছর না ঘুরতেই মালয়েশিয়া ২০০১ সালের জানুয়ারিতে আমাদের কর্মী নেওয়া বন্ধ করে দেয়। ২০০৩ সালের জুলাই মাসে মালয়েশিয়া আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয় এবং বাংলাদেশ থেকে কর্মী নেওয়ার জন্য ওই বছরের অক্টোবরে ঢাকায় একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ২০০৭-০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর অনৈতিক প্রতিযোগিতায় সৃষ্ট পরিস্থিতিতে মালয়েশিয়া ২০০৯ সালের মার্চ মাসে আমাদের কর্মী নেওয়া স্থগিত করে। এরপর নিষেধাজ্ঞা তুলে ২০১২ সালের নভেম্বর মাসে দুই দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত 'জিটুজি' পদ্ধতিতে কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এরই ভিত্তিতে ২০১৩ সালের এপ্রিল মাস থেকে কর্মীরা মালয়েশিয়ায় যাওয়া শুরু করেন।

> ২০১২ সালের ২৬ নভেম্বর বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশ থেকে 'জিটুজি' পদ্ধতিতে কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছিল, যা বিশ্ববাসীর, বিশেষ করে অভিবাসনের সঙ্গে যুক্ত সব সংস্থার প্রশংসা অর্জন করেছিল। যদিও মালয়েশিয়াগামী বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য ওই প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং অভিবাসনবান্ধব ছিল, কিন্তু স্বার্থান্বেষী মহলের উদ্দেশ্য পূরণ করছিল না বিধায় মাত্র ১০ হাজার কর্মী মালয়েশিয়ায় যাওয়ার পর প্রক্রিয়াটির অপমৃত্যু ঘটানো হয়। আমরা ওই পদ্ধতিটি ব্যবহার করে কর্মী পাঠাতে পারি। তবেআগের মতো যাতে না ঘটে সে জন্য রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোকে এই পদ্ধতিতে সংযুক্ত করতে হবে

মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি কর্মী প্রেরণের এক ব্যতিক্রমী ইতিহাস ছিল ২০১২ সালে স্বাক্ষরিত 'জিটুজি' পদ্ধতির সমঝোতা স্মারকটি। ওই পদ্ধতিতে একজন কর্মীর অভিবাসন ব্যয় ছিল ৩৫ হাজার টাকারও কম। তবে ওই পদ্ধতিটিকে ২০১৬ সালে ১০টি রিক্রুটিং এজেন্সির একটি সুবিধাবাদী কর্মী শোষক সিন্ডিকেট 'জিটুজি প্লাস' সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে গলা টিপে হত্যা করে। মালয়েশিয়ায় সরকার পরিবর্তন হলে ২০১৮ সালের মে মাসে ওই সিন্ডিকেটের শোষণ কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ২০২১ সালের ১৯ ডিসেম্বর দুই দেশের মধ্যে নতুন সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে প্রথমে ২৫টি হলেও পড়ে ১০০টি এজেন্সির সিন্ডিকেটের মধ্যেই মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানোর কাজটি চলতে থাকে। কিন্তু ২০২৪ সালের মে মাসের পর মালয়েশিয়ায় কর্মী যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়।

বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়া উভয় পক্ষের এজেন্সিগুলোর স্বার্থেই এই শ্রমবাজারটি আবার খুলবেএবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শোষণকর্ম শেষ হলে আবার বন্ধ হবে। আর দুদকের মামলা-মোকদ্দমার বোঝাও বেড়ে চলবে। মাঝ থেকে নিরুপায় বিদেশগামী কর্মীরা শোষণের জাঁতাকলে পিষ্ট হতেই থাকবেন। এ যে হাজার হাজার কোটি টাকার খেলা। এ খেলা থামাতে হলে একদিকে যেমন শোষণহীন কর্মীবান্ধব নিয়োগপদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করতে হবে, তেমনি তা বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং দেশপ্রেমিক নেতৃত্বের প্রয়োজন হবে।

আমরা জানি, ২০১২ সালের ২৬ নভেম্বর বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশ থেকে 'জিটুজি' পদ্ধতিতে কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছিল, যা বিশ্ববাসীর, বিশেষ করে অভিবাসনের সঙ্গে যুক্ত সব সংস্থার প্রশংসা অর্জন করেছিল। যদিও মালয়েশিয়াগামী বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য ওই প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং অভিবাসনবান্ধব ছিল, কিন্তু স্বার্থান্বেষী মহলের উদ্দেশ্য পূরণ করছিল না বিধায় মাত্র ১০ হাজার কর্মী মালয়েশিয়ায় যাওয়ার পর প্রক্রিয়াটির অপমৃত্যু ঘটানো হয়। আমরা ওই পদ্ধতিটি ব্যবহার করে কর্মী পাঠাতে পারি। তবে আগের মতো যাতে না ঘটে সে জন্য রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোকে এই পদ্ধতিতে সংযুক্ত করতে হবে।

এজেন্সিগুলোর কাজ হবে মার্কেটিং অর্থাৎ নিয়োগকারীদের কাছ থেকে কর্মী চাহিদা সংগ্রহ করে আমাদের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে জমা দেওয়া এবং অনুমোদন নেওয়া। মন্ত্রণালয় আমাদের দূতাবাস থেকে ওই সব চাহিদাপত্রের সত্যতা যাচাই করে আনার পর চাহিদা মোতাবেক বিদেশ যেতে ইচ্ছুক কর্মীদের ডেটা ব্যাংক থেকে কর্মী প্রেরণ করবে। কর্মীরা কর্মস্থলে যোগদান করার পরপরই রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো সরকারের নির্দিষ্ট করা হারে ফি পাবে। কর্মীদের সঙ্গে এজেন্সিগুলোর যোগাযোগ থাকায় যে অতিরিক্ত অর্থ নেওয়া হয় এই প্রক্রিয়ায়, সেটি কখনো সম্ভব হবে না, যদিও এজেন্সিগুলোর স্বার্থও সংরক্ষিত থাকবে। তবে যে প্রশ্নটি থেকেই যায়, তা হলো কর্মীদের পকেট থেকে অর্থ লুটপাটের এবং বিদেশে অর্থপাচারের বিদ্যমান সুযোগটা কি এজেন্সিগুলো এত সহজে হাতছাড়া করতে সম্মত হবে? এই দরিদ্র কর্মীদের প্রতি তাদের মানবিকতা কি কখনো জাগ্রত হবে না? আমাদের বিশ্বাস, সরকার যদি যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তাহলে এই পদ্ধতির বাস্তবায়ন কঠিন কিছু নয়।

লেখক : সাবেক রাষ্ট্রদূত ও সচিব

CamScanner

বন্দর উন্নয়ন ও বিদেশি বিনিয়োগ; সামনে যে বাস্তবতা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশের সমুদ্রবন্দরসমূহ– বিশেষত চট্টগ্রাম বন্দর– দেশের মোট বৈদেশিক বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দু। এই বন্দরগুলো শুধু পণ্য আনা-নেওয়ার অবকাঠামো নয়; বরং দেশের রপ্তানি প্রতিযোগিতা, শিল্প উৎপাদনশীলতা, লজিস্টিক খরচ এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণের সামগ্রিক সক্ষমতাকে নির্ধারণ করে। এমন এক প্রেক্ষাপটে চট্টগ্রামের লালদিয়ার চরে আধুনিক কনটেইনার টার্মিনাল নির্মাণ ও পরিচালনার দায়িত্ব ডেনিশ একটি কোম্পানির হাতে দেওয়ার সিদ্ধান্তকে অন্তর্বর্তী সরকার গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ সম্ভাবনা হিসেবে দেখছে। কিন্তু এটির বিরুদ্ধে যে আপত্তি ও সমালোচনা উঠছে– তা অর্থনৈতিক বাস্তবতার চেয়ে বেশি রাজনৈতিক–ব্যবসায়িক স্বার্থসংঘাতকে সামনে নিয়ে আসছে।

লালদিয়া টার্মিনাল নির্মাণে পশ্চিমা কোম্পানির সম্পৃক্ততাকে অনেকেই কৌশলগত অবকাঠামোর নিয়ন্ত্রণ বিদেশি প্রতিষ্ঠানের হাতে ছেড়ে দেওয়ার মতো হিসেব করছেন। সমালোচকদের মতে, এ ধরনের উদ্যোগ ভবিষ্যতে আর্থিক ঝুঁকি বাড়াতে পারে এবং আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোর ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ বাস্তবায়নের পথও সুগম করতে পারে। এ ছাড়া কর্ণফুলী নদীর ডান তীরে অবস্থানগত সুবিধা নিয়ে গড়ে উঠতে যাওয়া এই টার্মিনালটি মূল বন্দরের কার্যক্রমকে ব্যাহত করবে কি না, সেই প্রশ্নও উঠছে। বন্দর-সংশ্লিষ্ট অনেকেই আশঙ্কা করছেন– নতুন স্থাপনার উচ্চ ক্ষমতা ও আধুনিক সরঞ্জাম শেষ পর্যন্ত প্রধান বন্দরের কার্গো প্রবাহ কমিয়ে তার প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান দুর্বল করে দিতে পারে।

তবে, বিশ্বের প্রধান বন্দরগুলোর গত দুই দশকের অগ্রগতি দেখলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে আধুনিক বন্দর পরিচালনার ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণ বা আধা-বেসরকারিকরণ এখন আর ঐচ্ছিক কোনো সিদ্ধান্ত নয়; বরং বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার অবশ্যম্ভাবী কৌশল। রাষ্ট্রসমূহ মালিকানা ধরে রাখলেও কার্যকর ব্যবস্থাপনা, প্রযুক্তি একীকরণ, দক্ষ মানবসম্পদ এবং আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের সুবিধা নিতে বেসরকারি ও বিদেশি বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করছে। এই সমন্বিত কাঠামোই আজকের সফল বন্দরের মূল শক্তি।

সিঙ্গাপুরের পিএসএ– যা বিশ্বের অন্যতম দক্ষ ও লাভজনক বন্দর অপারেটর– রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন হলেও পরিচালনায় পুরোপুরি বাণিজ্যিকীকরণ ও স্বায়ত্তশাসনের নীতিতে চলে। পিএসএ-এর দক্ষতা, স্বচ্ছ কাঠামো এবং ক্রমাগত প্রযুক্তি হালনাগাদ সিঙ্গাপুর বন্দরের টার্ন-অ্যারাউন্ড টাইমকে বিশ্বের দ্রুততম পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে। কন্টেইনার স্ক্যানিং, অটোমেটেড স্ট্যাকিং ক্রেন, রোবোটিক ট্রাক, রিয়েল-টাইম লজিস্টিক অ্যানালিটিক্স– এই সবই এসেছে কার্যকর ব্যবস্থাপনা ও বিনিয়োগ নিশ্চিত হওয়ার কারণে। এর ফলে সিঙ্গাপুর আজ শুধু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াই নয়, বরং পুরো প্রশান্ত-মহাসাগরীয় অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ ট্রানশিপমেন্ট কেন্দ্র।

একইভাবে মধ্যপ্রাচ্যের সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইতে অবস্থিত গভীর সমুদ্র বন্দর জেবেল আলী বন্দর পরিচালনায় ডিপি ওয়ার্ল্ড-এর ভূমিকা একটি অনন্য দৃষ্টান্ত। রাষ্ট্র মালিকানা ধরে রেখেছে, কিন্তু অপারেশন পরিচালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মানের বন্দর অপারেটরের মাধ্যমে। ডিপি ওয়ার্ল্ড তাদের বাণিজ্যিক অভিজ্ঞতা, প্রযুক্তি, শিপিং লাইনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ নেটওয়ার্ক এবং কৌশলগত বিনিয়োগের সমন্বয়ে জেবেল আলীকে মধ্যপ্রাচ্যের কেন্দ্রীয় বাণিজ্য হাবে পরিণত করেছে। আজ এই বন্দর দিয়ে শুধু উপসাগরীয় বাণিজ্যই নয়, আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়ার ট্রানশিপমেন্ট পণ্যও প্রবাহিত হয়। এই প্রবৃদ্ধির পেছনে মূল চালিকাশক্তি হলো দক্ষ ব্যবস্থাপনা– যা পুরোপুরি বাণিজ্যিক যুক্তিতে পরিচালিত।

ভারতের বন্দর ব্যবস্থায় গত এক দশকের সংস্কারও বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। গুজরাটের মুন্দ্রা পোর্ট, যা আদানি গ্রুপ পরিচালনা করে, আজ ভারতের সবচেয়ে ব্যস্ত ও দ্রুততম বর্ধনশীল বন্দর। সরকারি মালিকানাধীন কিছু বন্দরের বিপরীতে মুন্দ্রা দ্রুত বিনিয়োগ, আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং ডিজিটাল লজিস্টিক ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ করে ভারতীয় রপ্তানি খরচ কমিয়েছে এবং কার্যক্রমে স্বচ্ছতা এনেছে। ভারতের নীতি-সংস্কার বলছে– রাষ্ট্র কৌশলগত মালিকানা ধরে রাখবে, কিন্তু অপারেশন পরিচালনা করবে দক্ষ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। এই মডেল ভারতকে বৈশ্বিক

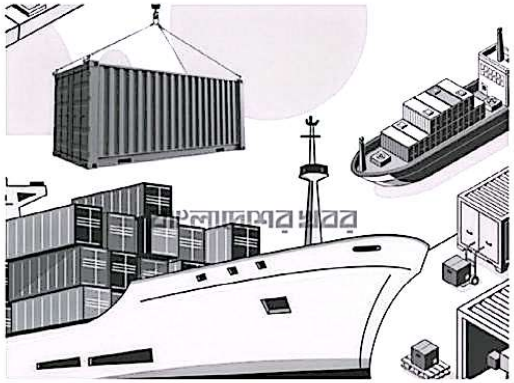

বন্দর র‍্যাংকিংয়ে আরো প্রতিযোগিতামূলক করেছে।

ইউরোপের অধিকাংশ প্রধান বন্দর– রটারডাম, অ্যান্টওয়ার্প, হামবুর্গ– রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানের আওতায় থাকলেও বাস্তব পরিচালনা চলে আন্তর্জাতিক কনসোর্টিয়াম এবং বেসরকারি অপারেটরের মাধ্যমে। এই বন্দরে নিরাপত্তা, নিয়ন্ত্রণ এবং নীতি সবই সরকার নির্ধারণ করে, কিন্তু দৈনন্দিন কার্যক্রম বাণিজ্যিক দক্ষতার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। এই সমন্বয় স্থানীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নেটওয়ার্ককে গভীর করেছে।

এই সব উদাহরণ একটাই বার্তা দেয়– বন্দর আজ আর কেবল রাষ্ট্রীয় সম্পদ নয়; এটি একটি উচ্চ-প্রযুক্তির প্রতিযোগিতামূলক শিল্প, যেখানে দক্ষতা, অটোমেশন, ডেটা-নির্ভর সিদ্ধান্ত এবং বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক বন্দর পারফরম্যান্সের মূল মানদণ্ড। ফলে রাষ্ট্র যদি শুধুমাত্র প্রচলিত সরকারি কাঠামোর ওপর নির্ভর করে বন্দর পরিচালনা করে, তবে আধুনিকীকরণ, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, উচ্চমাত্রায় বিনিয়োগ বা আন্তর্জাতিক লজিস্টিক সংযোগ– কোনোটিই যথাসময়ে অর্জন করা সম্ভব নয়।

বাংলাদেশ এখনো এই পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক মানদণ্ড গ্রহণে পিছিয়ে আছে। দেশের বন্দরগুলো এখনো প্রচলিত আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে, যেখানে প্রযুক্তি হালনাগাদ ধীর, দক্ষতা উন্নয়ন সীমিত, বিনিয়োগের গতি কম এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সময়ক্ষেপণ স্বাভাবিক ঘটনা। বৈশ্বিক বাজারে প্রতিযোগিতা তীব্র হওয়ায় এই ব্যবস্থাপনা আর কার্যকর নয়। ফলে যে দেশগুলো দ্রুত আধুনিক বন্দরে রূপান্তর ঘটাচ্ছে– তারা বাংলাদেশের সামনে এগিয়ে যাচ্ছে।

একটি আন্তর্জাতিক কোম্পানিকে বন্দর লিজ দেওয়া হলে তা অন্য বিদেশি কোম্পানিগুলোর কাছে একটি ইতিবাচক সংকেত দেবে, যা ভবিষ্যতে বাংলাদেশে আরও বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) আকর্ষণ করতে সাহায্য করবে।

এই কারণে আন্তর্জাতিকভাবে পরীক্ষিত অপারেটর যুক্ত করা শুধুমাত্র বৈদেশিক বিনিয়োগ নয়; বরং বাংলাদেশের বন্দরকে ২১ শতকের প্রতিযোগিতার উপযোগী করার কৌশলগত ভিত্তি।

দেশের বন্দরগুলো দীর্ঘদিন ধরে নানা অদক্ষতা, দীর্ঘসূত্রতা, প্রযুক্তিগত পশ্চাৎপদতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতার সঙ্গে লড়ছে। তদুপরি, অনিয়ম ও স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর প্রভাব বন্দরের কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে এসেছে, যা আমদানি-রপ্তানি খরচ বাড়িয়েছে এবং ব্যবসায়িক পরিবেশকে অস্থিতিশীল করেছে। ফলে বেসরকারি বা বিদেশি অপারেটর যুক্ত হলে যে স্বচ্ছতা ও পেশাদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে– তা অনেক গোষ্ঠীর পুরোনো সুবিধা হুমকির মুখে ফেলবে। এই কারণেই অনেক আপত্তি ও প্রতিবাদ অর্থনৈতিক যুক্তির ভিত্তিতে নয়, বরং রাজনৈতিক ব্যবসায়িক নিয়ন্ত্রণ হারানোর আশঙ্কা থেকে উঠে আসে।

আমাদের মনে রাখতে হবে, আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বন্দর লিজ দেওয়া বা অপারেশন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের হাতে দেওয়া কোনোভাবেই সম্পদের মালিকানা হস্তান্তর নয়। বরং এটি একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের চুক্তি, যেখানে রাষ্ট্র মালিকানা বজায় রাখে এবং বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান ঝুঁকি, প্রযুক্তি, দক্ষতা ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন সেবা নিয়ে আসে। বাংলাদেশ নিজস্ব বিনিয়োগে স্বল্প সময়ে লজিস্টিক অটোমেশন, অটোমেটেড ক্রেন, আধুনিক কার্গো ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার, রিয়েল-টাইম ট্র্যাকিং বা এআই-চালিত টার্মিনাল প্ল্যানিং সিস্টেম স্থাপন করতে পারবে– এমন ধারণা বাস্তবসম্মত নয়। কিন্তু এসব প্রযুক্তি বিদেশি অপারেটরের কাছে ইতোমধ্যেই পরীক্ষিত, ফলে বাংলাদেশ এই সুবিধা দ্রুত পেতে পারে।

তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সময়। বন্দর উন্নয়ন নিয়ে সিদ্ধান্ত যত বিলম্বিত হবে, বাংলাদেশ তত বেশি প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়বে। আন্তর্জাতিক শিপিং লাইনগুলো ইতোমধ্যে ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া বা ভারতের উন্নত বন্দরগুলোর দিকে মনোযোগ বাড়িয়েছে। বন্দর অদক্ষতার কারণে জাহাজের টার্ন-অ্যারাউন্ড টাইম বাড়লে বাংলাদেশি রপ্তানিকারকদের খরচ বাড়ে এবং বৈশ্বিক বাজারে তাদের প্রতিযোগিতা কমে যায়। এই কারণে বন্দর উন্নয়ন সংক্রান্ত যেকোনো সংস্কার সিদ্ধান্ত দীর্ঘসূত্রতায় ভুগলে তার সরাসরি নেতিবাচক প্রভাব পড়বে দেশের অর্থনীতিতে।

অবশ্যই সিদ্ধান্তটি হঠকারিতা দিয়ে নেওয়া উচিত নয়। বিনিয়োগ, নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব, শ্রমিকস্বার্থ, পরিবেশগত ঝুঁকি এবং দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক লাভ-ক্ষতির বিশ্লেষণ– সবকিছুই বিবেচনায় রাখতে হবে। তবে প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত শ্লথতা দেশের জন্য ক্ষতিকর। স্বচ্ছ ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন টার্মিনাল ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা হলে দেশীয় অর্থনীতি উপকৃত হবে সবচেয়ে বেশি– কেননা রপ্তানি খরচ কমবে, সরবরাহ চক্র দ্রুত হবে, বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে এবং বাংলাদেশের সামগ্রিক লজিস্টিক র‍্যাংকিং উন্নত হবে।

সার্বিকভাবে বিবেচনা করলে দেখা যায়, বাংলাদেশের বন্দর উন্নয়ন এখন আর কেবল অবকাঠামো উন্নয়নের বিষয় নয়; এটি দেশটির ভবিষ্যৎ বাণিজ্য কাঠামো ও বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় অবস্থান নির্ধারণের কৌশলগত সিদ্ধান্ত। বিদেশি অভিজ্ঞতা ও পেশাদারি পরিচালন ব্যবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে দেশ শুধু আধুনিক অবকাঠামোই অর্জন করবে না, বরং একটি স্বচ্ছ, দক্ষ ও টেকসই বন্দর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সুযোগ পাবে। এই সুযোগ অকারণে হারালে ক্ষতিটা কেবল অর্থনীতির নয়– বরং জাতীয় কৌশলগত স্বার্থেরও হবে। এখন দরকার– চুক্তির শর্তাবলী সম্পূর্ণ স্বচ্ছভাবে জনগণের সামনে তুলে ধরা এবং বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ শতভাগ সুরক্ষিত রেখে দ্রুত চুক্তি চূড়ান্ত করা।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী
masud.news1@gmail.com

CamScanner

অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি ক্ষুদ্র-মাঝারি ঋণব্যবস্থা

মো. আকতার হোসাইন

বাংলাদেশে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় মাঝারি ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে জনপ্রিয় হচ্ছে। অন্যদিকে ব্যাংকগুলোতে করপোরেট বা বৃহৎ ঋণের প্রতি আগ্রহ ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে। ফলে মাঝারি ও ক্ষুদ্রঋণের প্রতি ব্যাংকের আগ্রহ ও ক্ষুদ্রঋণ বিতরণে নমনীয় মনোভাব পোষণ করলেও, এর অগ্রগতি ধীর। বিষয়টি উপলব্ধি করে, এই খাতে সরকার গুরুত্ব দিয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূস গত ১৭ মে এমআরএর নতুন ভবন উদ্বোধন করার সময় বলেন, ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাই (মাইক্রোক্রেডিট) ব্যাংকিংয়ের ভবিষ্যৎ এবং এজন্য পৃথক আইন প্রণয়নের আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, 'এনজিও ভাবনা থেকে বেরিয়ে মাইক্রোক্রেডিটকে ব্যাংকিংয়ের ধারণায় গ্রহণ করতে হবে ব্যাংকগুলোকে। এ ধারণা গ্রহণ করেই সেবা দিতে হবে'। অনেক বিশেষজ্ঞ এই ধারণার সঙ্গে একমত পোষণ করেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে দুটি জায়গাতেই মাঠ পর্যায়ে কাজ করায় সামান্য অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। আমার কর্মজীবন শুরু হয় এনজিও দিয়ে। বাস্তবতার আলোকে দুটি বিষয়ে আলাদা করে একটু লেখার চেষ্টা করছি।

বর্তমানে অনেক এনজিও ক্ষুদ্রঋণের পাশাপাশি মাঝারি ঋণও দিয়ে থাকে। মাঝারি ব্যবসায়ীরা চাইলে, এনজিও এবং ব্যাংক- উভয় স্থান থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারেন। এনজিও থেকে ঋণ নিতে হলে আপনার পূর্বের ক্ষুদ্রঋণের অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো, না থাকলেও ঋণ পাবেন না- বিষয়টা এমন নয়

লেখক
ব্যাংকার ও কলামিস্ট
aktarrofikul@gmail.com

প্রথমেই এনজিও নিয়ে একটু ধারণা দেওয়া যাক। বর্তমান সময়ে মানুষের প্রতি মানুষের আস্থা-বিশ্বাস নেই বললেই চলে। বিশেষ করে, অর্থ লেনদেনের ক্ষেত্রে। আপনার অর্থের প্রয়োজন হতেই পারে অথবা ব্যবসা শুরু করার প্রয়োজন বা একটি ব্যবসা শুরু করবেন, কিন্তু আপনার অর্থের সংকট রয়েছে বা আপনার কাছে ব্যবসা শুরু করার মতো যথেষ্ট অর্থ নেই। তাহলে এজন্য এনজিওই একমাত্র উৎস। আপনি খুব সহজেই এনজিও থেকে কোনো প্রকার অভিজ্ঞতা ছাড়া এবং জামানতবিহীন ঋণ পেতে পারেন। একজন ব্যবসায়ীর জন্য আস্থার জায়গা হতে পারে এনজিও। বর্তমান বাংলাদেশের প্রায় ২ হাজার ৩৩১টি এনজিও থেকে ঋণগ্রহণ করেছে সাধারণ দরিদ্র শ্রেণির ঋণগ্রহীতারা। রাস্তার পাশে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, কামার-কুমার বা টংয়ের চায়ের দোকান থেকে শুরু করে এমন কোনো ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী নাই যে, এনজিও থেকে ঋণ গ্রহণ করেননি। ব্যবসা করতে গেলে, ঋণের প্রয়োজন আছে এবং সেই ঋণের জন্য এনজিও রয়েছে। কোনো প্রকার কাগজপত্রের ঝামেলা ছাড়া, জামিনদার ও জামানতবিহীন আপনাকে ঋণ দিয়ে থাকে এই এনজিওগুলো। এরপর ঋণ পরিশোধের জন্য আপনার সুবিধামতো মাসিক ও সাপ্তাহিক কিস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। বর্তমানে অনেক এনজিও ক্ষুদ্রঋণের পাশাপাশি মাঝারি ঋণও দিয়ে থাকে। মাঝারি ব্যবসায়ীরা চাইলে, এনজিও এবং ব্যাংক- উভয় স্থান থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারেন। এনজিও থেকে ঋণ নিতে হলে আপনার পূর্বের ক্ষুদ্রঋণের অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো, না থাকলেও ঋণ পাবেন না- বিষয়টা এমন নয়। আপনি অবশ্যই এনজিও হতে ঋণ পাবেন। এমনকি আপনি কাগজপত্রের ঝামেলা ছাড়াই ঋণ পাবেন। অনেক সময় মৌখিকভাবে ব্যক্তিকে জামানত হিসেবে রাখা হয়, এর বেশি কিছু নয়।

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূস ক্ষুদ্রঋণের প্রতি গুরুত্ব দিতে বলেছেন। কারণ দেশের একটা বৃহৎ অংশই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। এই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী যদি তাদের স্ব স্ব স্থানে স্বাবলম্বী হয়, তাহলে দেশ ও জাতি অর্থনীতি হতে মুক্তি পাবে, বাড়বে কর্মসংস্থানও। সমাজে তথা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কম সংখ্যকের প্রতি সবার বিশেষত ব্যাংক ব্যবস্থার নজর থাকে, তাহলে দেশের অর্থনীতি কখনই ঘুরে দাঁড়াবে না। সবার নজর অবশ্যই বৃহৎ অংশের ওপর দিতে হবে। তবে যদি সব এনজিওর ঋণের তথ্য একই সফটওয়্যারের মাধ্যমে সংরক্ষিত হতো, বিশেষত ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরোর (সিআইবি) মতো করে সব ঋণের তথ্য অর্থাৎ ব্যক্তি পূর্বে কোনো এনজিও থেকে কি পরিমাণ ঋণ নিয়েছে এবং কীভাবে পরিশোধ করেছে, তার ধরন উপস্থাপিত হতো- তাহলে এনজিওগুলো আরও বেশি ঋণ আদায়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারত। ঋণগ্রহীতাও বুঝতে পারত একবার কোনো এনজিও থেকে ঋণ গ্রহণ করে পরিশোধ না করলে, অন্য এনজিও হতে আর ঋণ পাওয়া যায় না, তাহলে তারাও ঋণ পরিশোধে বাধ্য হতো। ফলে এনজিওগুলো অর্থনীতিতে আরও বেশি ভূমিকা রাখতে পারত। আপনি মানেন আর না মানেন, ক্ষুদ্রঋণ ও ঋণের কিস্তির চাপ আছে বলেই তীব্র শীত এবং মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যেও আপনি রাস্তায় রিক্সা পান, যা আপনার বিপদে উত্তম সহায়ক হিসেবে কাজ করে। এবার আসা যাক ব্যাংক ব্যবস্থা নিয়ে, সমাজে একটি প্রবাদ আছে- ব্যাংক হলো ভরা নদীতে পানি ঢালার মতো, যেখানে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট আছে, সেখানে আবারও যোগ করা। অর্থাৎ আপনার ব্যবসার অভিজ্ঞতা আছে, জামানত দেওয়ার সক্ষমতা রয়েছে, তবেই আপনি ঋণের যোগ্যতা অর্জন করবেন। আপনি যে ঋণ পাবেন, সেটি আরও পরের বিষয়। এরপর রয়েছে বিচার-বিশ্লেষণ। বাংলাদেশ ব্যাংক কড়াকড়ি আরোপ ও নির্দেশনা দেওয়ার পর, দেশের সব তফসিলি ব্যাংকের সব শাখায় একটি করে এসএমই হেল্পডেস্ক রাখা হয়েছে। প্রায় সব ব্যাংক বাধ্য হচ্ছে, কিছু পরিমাণ পর্যন্ত জামানতবিহীন ঋণ বিতরণ করতে। জামানতবিহীন হলেও প্রায় সব ব্যাংকই ওপেন চেক (অর্থের পরিমাণ না লিখে) ব্যাংকের নিজের নামে লিখে চেক গ্রহণ করে, তবেই ঋণটি বিতরণ করেন। যা পরবর্তী সময় ঋণ খারাপ হলে এনআই অ্যাক্টের আওতায় ফৌজদারি আদালতে মামলার মাধ্যমে ঋণ আদায় করা হয়। ব্যাংক বাধ্য হয়ে এ কাজটি করে থাকে। তার মানে হলো, জামানতবিহীন মনে হলেও প্রকৃত অর্থে জামানতবিহীন নয়। তবে একটি বিষয় বিবেচ্য হলো- ঋণ পরিশোধের চাপ না থাকলে, সবাই ঋণ পরিশোধে উদাসীন হয় বলেই ব্যাংক এ কাজটি করে এবং এনজিওগুলো ঋণের কিস্তি আদায়ের জন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে দিনের কিস্তি দিনে আদায় করেন এবং ঋণের কিস্তি আদায় না হওয়া পর্যন্ত ওই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেই ঋণ কর্মকর্তা অবস্থান করেন। ফলে এক রকম বাধ্য হয়েই ঋণগ্রহীতা ঋণের কিস্তি পরিশোধ করেন। ব্যাংকের ক্ষেত্রে ভিন্ন। ব্যাংক কর্মকর্তা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে ঋণের কিস্তি আদায় করেন না, ঋণগ্রহীতা স্বপ্রণোদিত হয়ে নিজেই নিজের কিস্তি পরিশোধ করেন। কারণ ঋণগ্রহীতা জানেন, ঋণ পরিশোধ না করলে মামলা-মোকদ্দমাসহ পরবর্তীকালে ঋণ না পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, এই বাধ্যবাধকতা থেকেই ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধ করেন। তবে দুয়েকটি ব্যাংক এনজিও স্টাইলে কাজ করে বলে, তারা পুরোপুরি জামানতবিহীন ঋণ দিয়ে থাকেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা হলো- একটি ব্যাংকের বিতরণকৃত মোট ঋণের ২৫ শতাংশ সিএমএসএমই খাতে ঋণ বিতরণ করতে হবে। ব্যাংকগুলো অনেকক্ষেত্রেই যা করে, তারা তাদের ব্যবসার বিষয়টি বিবেচনা করে বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের অঙ্গসংগঠন বা তাদের ছোট অথবা সদ্য প্রতিষ্ঠিত কোনো অংশে বিতরণ করে থাকেন এবং ওই বিতরণকৃত ঋণটি এসএমই খাতে বিতরণ হিসেবে দেখিয়ে থাকে। এর ফলে প্রকৃত উদ্যোক্তারা বঞ্চিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে, গত অর্থবছরে সিএমএসএমই খাতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ঋণের পরিমাণ (স্থিতি) ছিল ৩ লাখ ৩ হাজার ১২০ কোটি টাকা, যা ব্যাংক খাতের মোট ঋণের প্রায় ১৯ শতাংশ। ২০২৩ সালের তুলনায় গত বছর এসএমই ঋণের প্রবাহ বেড়েছে মাত্র শূন্য দশমিক ৪৩ শতাংশ বা ১ হাজার ২৭ কোটি টাকা (প্রথম আলো, ৩০ মে, ২০২৫)। ব্যাংকে ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কাগজপত্রের ঝামেলাও একটু বেশি, ঋণের সুদ হার কম এবং ঋণ আদায়ে হার অনেক কম, ফলে ব্যাংকগুলোর আগ্রহ একটু কম ছোট ঋণ বিতরণে। ঋণের সুদহার কম হওয়ার ফলে ওই ঋণের চহিদা অনেক বেশি হয় এবং অনেক সময় ঋণ প্রদানকারী অফিসাররা অনৈতিক লেনদেন জড়িয়ে ফেলেন। ফলে অনেকেই ভাবে, এ ঋণ পরিশোধ না করলেও চলবে। এ ধারণা থেকে বের হতে হবে ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়কেই। ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সুদহার বিষয় নয়।

অর্থনীতিবিদ আকবর আলী খান তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'আজব ও জবর-আজব অর্থনীতি' গ্রন্থে উল্লেখ করেন 'দরিদ্র মানুষ সুদের হার নিয়ে তত চিন্তিত নয়, যত উদ্বিগ্ন তারা ঋণপ্রাপ্তি নিয়ে। চড়া সুদ দিতে হলেও তাদের ঋণ প্রয়োজন। যদি গরিব লোকেরা প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ না পায়, তাহলে তাদের মহাজনের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নিতে হয়'। তাই মহাজনের হাত থেকে রক্ষার জন্য হলেও এবং ব্যাংকগুলো হতে সহজে ঋণপ্রাপ্তির দুষ্প্রাপ্যতা থেকে রক্ষার জন্য হলেও এনজিওগুলোর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অপরদিকে এসএমই খাতের মাধ্যমে প্রায় ৮০-৮৫ শতাংশ মানুষের কর্মসংস্থান হয়ে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ হিসাব বলছে, ৭৮ লাখ সিএমএসএমই উদ্যোক্তার মধ্যে ১ লাখ ৭ হাজার ৩৩৪ কোটি টাকা ঋণ পেয়েছেন মাত্র ছয় লাখ ৭৯ হাজার ৫২৪ জন উদ্যোক্তা (কালের কণ্ঠ, ৩১ মে, ২০২৫)। ব্যাংকগুলোর ভাবনা হলো, দশটি ঋণ দেওয়ার পরিবর্তে একটি ঋণ দিলে সময় ও শ্রম এবং ব্যাংকের মুনাফা সব ক্ষেত্রেই ব্যাংক লাভবান হবে। যেহেতু দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানের বিচরণ সর্বত্র। কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এবং দেশের অর্থনীতি খাত দুটি ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ছাড়া চিন্তাই করা যায় না। সুতরাং ব্যাংকগুলো যাতে এই এসএমই খাতকে পাশ কাটিয়ে যেতে না পারে, তার জন্যই বাংলাদেশ ব্যাংকের এই বাধ্যবাধকতা। মাইক্রোক্রেডিট তথা ক্ষুদ্রঋণের গুরুত্ব অনুধাবন করার জন্য ব্যাংকগুলোর প্রতি অন্তর্বর্তী সরকার প্রধানের এ আহ্বান। তা ছাড়া বাংলাদেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে হলে এবং বেকারত্ব দূর করতে হলে অবশ্যই এই খাতটি চাঙ্গা করতে হবে। আমাদের দেশে আইন আছে, কিন্তু আইনের প্রয়োগ বিষয়টি বিবেচ্য নয়। তাই আইনের প্রয়োগটি যদি যথাযথ নিশ্চিত করা যেত, তবেই প্রকৃত চিত্র ফুটে উঠত, অর্থনীতির এক নতুন দিগন্ত সূচনা হতো। এর ফলে তৈরি হবে নতুন এক বাংলাদেশ- যে বাংলাদেশ সবারই চাওয়া।

CamScanner

COP30 does little to save our planet

MOTAHER HOSSAIN

The two-week COP30 summit, held in Belém-Brazil's city near the Amazon-failed to ignite any real hope for protecting the planet. The responsibility for this failure does not lie solely with the host country, Brazil, but also with industrially advanced nations and the United Nations, which is tasked with safeguarding the world's forests and climate. Just like previous COP conferences, this one ended in yet another repetition of disappointment. As in the past 29 summits, COP30 remained shrouded in the same fog of failure.

Despite grand declarations-reducing fossil fuel use and cutting carbon emissions-the global event once again collapsed under the weight of unfulfilled promises. What's more heartbreaking is that nations vulnerable to climate change, including Bangladesh, small island states, and Indigenous communities of the Amazon, saw their hopes crushed. It wasn't only Indigenous peoples who expressed despair; the entire planet-exhausted by industrialization, capitalism, and rapid urbanization-felt the disappointment. On Saturday, the summit wrapped up loudly but without any major agreement, ending in deep frustration. Climate experts, civil society groups, and international media unanimously labeled COP30 as ineffective and fruitless.

Even delegations from vulnerable nations, who arrived in hope, ultimately called the conference "incomplete." On the summit's most crucial agenda-halting fossil fuel use and stopping deforestation-no decision was reached. The world's powerful fossil-fuel exporting nations strongly opposed the proposals, forcing the talks to collapse. In the end, COP30 concluded with only a nominal agreement: financial assistance for poorer countries affected by climate impacts.

Brazil, the host nation, claimed that COP30 would be a "turning point" for global climate cooperation. They urged nations to reach consensus on the future of fossil fuels, climate finance, and emission reduction. COP30 president André Corrêa do Lago said, "This issue must not divide us. We must reach an agreement."

France's environment minister blamed the failure on fossil-fuel rich nations such as Saudi Arabia and Russia, as well as coal-producing countries like India, China, and several emerging economies, for refusing to accept language aimed at ending fossil fuel use. The COP28 agreement in Dubai in 2023 promised steps to transition away from fossil fuels, but the failure to implement this fueled deep frustration. Thirty-six countries-including wealthy, emerging, and island nations-warned Brazil in a formal letter that they would not accept any agreement without a plan to phase out oil, gas, and coal. The agreement that finally emerged focused only on expanding financial support for poorer nations.

Wealthy countries agreed to triple climate finance by 2035. Ultimately, the final COP30 agreement was signed without any agenda on reducing fossil fuel use. On November 22 in Belém, nearly 200 countries endorsed a deal promising increased financial support for vulnerable nations, but the agreement made no direct mention of limiting the very driver of global warming-fossil fuels.

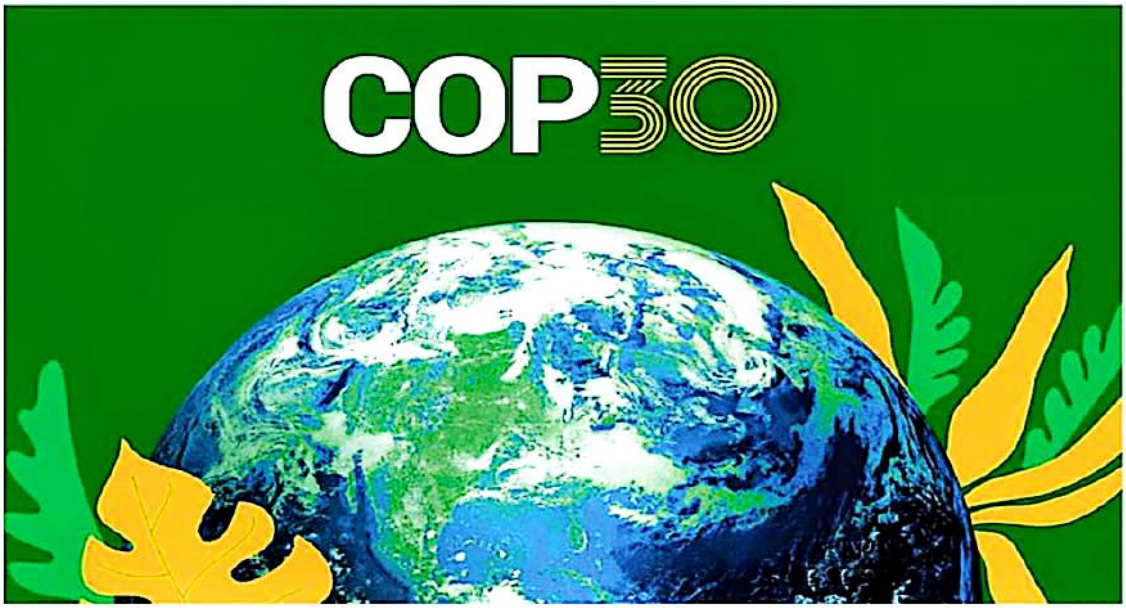

Talks went past the deadline, extending 12 hours longer than scheduled. A total of 194 countries and territories agreed to the text. While Brazil expressed hope that future climate action would become more coordinated, uncertainty deepened as the United States did not send a delegation. UN Climate Secretariat chief Simon Stiell said that despite divisions, nations managed to reach a compromise, saying, "We are still fighting." The discussions revealed deep conflicts over fossil fuels. Countries like Saudi Arabia and Russia blocked efforts to outline plans for reducing oil use. The final agreement merely suggested beginning discussions about gradually lowering fossil fuel use, without any firm commitment. No measures were included to prevent deforestation, disappointing environmental groups and even the host country.

Several neighboring countries-including Colombia, Panama, and Uruguay-criticized the negotiation process. The European Union supported the agreement but expressed serious concerns about its weaknesses.

COP30's core goals were to reduce greenhouse gas emissions and strengthen UN frameworks for vulnerable nations. The outcome shows that while limited global coordination is possible, ambitious climate action remains far out of reach.

During the summit, nearly 200 nations signed a narrow agreement. Meanwhile, Indigenous groups protested against forest destruction, demanding an end to agricultural expansion, oil exploration, illegal mining, and logging on their lands. Their demands went beyond funding-they wanted real protection of land and livelihoods. Yet no meaningful solutions emerged. COP30 ended with mere symbolic discussions.

Throughout the conference, more than 80 countries, alongside the EU and the UK, demanded firm action on cutting fossil fuel use. But oil-rich nations like Saudi Arabia and Russia refused, unwilling to risk their economic interests. The disagreements led to widespread chaos in the summit. COP30 president André Corrêa do Lago acknowledged that many had hoped for bold action against climate change, saying he did not want to disappoint them.

The decision angered countries like Colombia, Panama, and Uruguay. Controversy also erupted over the summit's leadership. On the final day, opposing countries were reportedly not allowed to lodge objections. For the first time in COP history, the United States sent no delegation, prompting many to believe that the absence of the world's largest historical emitter influenced the summit's outcome.

In a last-minute turn, the EU rejected the draft agreement, claiming it did nothing to advance global emission reduction. The EU said the proposal was too weak, while some developing countries accused the EU of being strict about fossil fuels but failing to commit to increased climate finance. The EU's climate commissioner said the proposal was "unacceptable." A negotiator from a developing nation declared, "If there is a path for fossil fuels, then there must be a path for climate finance."

Talks continued late into the night, with the Arab Group-22 oil-rich nations-declaring that any discussion targeting their energy sector was "unacceptable." Saudi Arabia warned that targeting their industry would lead to "collapse of negotiations."

Earlier, nearly 80 countries demanded a roadmap for phasing out fossil fuels. Now, all hopes rest on COP31 in Turkey, with the expectation that it will finally show the world a path to saving the planet by reducing fossil fuel use.

The writer is an Editor, ClimateJournal24.com and General Secretary, Bangladesh Climate Change Journalist Forum (BCCJF)

CamScanner

সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে নৈতিকতা জাগ্রত হোক

মুহাম্মদ এনামুল হক মিঠু

স্বাধীনতার প্রায় অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে গেছে। এটি খুব অল্প সময় নয়, আবার খুব দীর্ঘও নয়। এ সময়ের মধ্যেই দরিদ্র এশিয়ার বহু দেশ বিস্ময়কর অগ্রগতি অর্জন করে প্রথম বিশ্বের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে। আমরাও উন্নয়নের মহাসড়কে এগিয়েছি, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেই উন্নতির প্রকৃত সুফল এখনো সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবনে পৌঁছায়নি। নব্য সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার রূপান্তর ঘটেনি। জনগণের প্রত্যাশা, মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার ও সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনের স্বপ্ন পূরণ হয়নি।

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও সমাজচিন্তাবিদ ড. রেহমান সোবহান যথার্থই বলেছেন 'মুক্তিযুদ্ধের সময় সবার জন্য সমতাভিত্তিক যে সমাজ গড়ার প্রতিশ্রুতি ছিল, সেটি আজও বাস্তবায়িত হয়নি। স্বাধীনতার ৫৪ বছর পরও বাংলাদেশের নিরন্তর মুক্তির সংগ্রাম চলছে।' সত্যিই, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, প্রবৃদ্ধির হার বা সূচক দিয়ে উন্নতির মানদণ্ড নির্ধারণ করলেই সমৃদ্ধির প্রতিফলন পাওয়া যায় না। মানুষের জীবনমান, নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার, সুখ-শান্তি ও মানবিকতার অবস্থাই আসল সূচক। সে জায়গাটিই দুর্বল রয়ে গেছে।

আজ প্রশ্ন ওঠে আমরা কি মহান মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন পূরণ করতে পেরেছি? কেন আমাদের নৈতিকতাবোধ ক্ষয়ে যাচ্ছে? কেন দেশপ্রেম ম্লান হয়ে যাচ্ছে? কেন ন্যায্য ও সাম্যভিত্তিক সমাজ গড়ে উঠছে না?

এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে সমাজব্যবস্থা, রাজনীতি, শাসনব্যবস্থা ও নৈতিকতার সংকট সামনে এসে দাঁড়ায়। আমাদের সমাজে সীমাহীন লোভ-লালসা, ভোগবিলাস, প্রতিহিংসা, বিদ্বেষ, নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, সামাজিক-রাজনৈতিক স্বচ্ছতার অভাব, জবাবদিহিহীনতা ও দায়িত্বহীনতার গভীর শিকড় বহুদিন ধরে বিস্তৃত। এসব শিকড় থেকে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন অপরাধ জন্ম নিচ্ছে মানবিকতা, সততা, নীতিবোধ ও সামাজিক বুনন ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

নারী ও শিশুর প্রতি নৃশংসতা, কিশোর গ্যাং, ছাত্ররাজনীতির সন্ত্রাস, টর্চার সেল, ক্যাসিনো সংস্কৃতি, শেয়ারবাজার-ব্যাংক লুণ্ঠন, চাঁদাবাজি-টেন্ডারবাজি, খাদ্যে ভেজাল, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে অব্যবস্থা, প্রশ্নফাঁস, অবিরাম সড়ক দুর্ঘটনা, গুম-খুন-ধর্ষণ, নদী-জলাশয় দখল—এসব কি শুধু বিচ্ছিন্ন ঘটনা?

না, এগুলো নৈতিকতার ভয়াবহ অবক্ষয়েরই প্রতিচ্ছবি। বর্তমানে দেখা যায়, চোখের সামনে অপরাধ ঘটলেও মানুষ এগিয়ে আসে না। এমন সমাজ ভয়াবহ সংকেত বহন করে। নৈতিক জাগরণ ছাড়া এসব অপরাধ দমন সম্ভব নয়।

অন্যদিকে দুর্নীতিও আজ সর্বগ্রাসী। রাষ্ট্র, সমাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় সবখাতেই দুর্নীতির দখলদারত্ব বিস্তৃত। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের জরিপ অনুযায়ী, দুর্নীতি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা। আর্থিক খাত থেকে শুরু করে প্রশাসনের নানা স্তরে চলছে 'পুকুর নয়, সাগরচুরি'। ফলে ধনী-গরিবের বৈষম্য বাড়ছে, সামাজিক অবিচার তীব্রতর হচ্ছে। ২০২৫ সালেও দুর্নীতির শেষ নেই। দেখা যায়, যে-ই সরকার ক্ষমতায় থাকুক আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি কেউই দুর্নীতির উর্ধ্বে থাকতে পারেনি। উন্নয়ন হয়েছে, আবার উন্নয়ন বিকৃতিও হয়েছে। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের সময়েও একই নৈতিক সংকট স্পষ্ট। নৈতিক-অনৈতিক, আইনসঙ্গত-অবৈধ, ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্যবোধ যেন অনেকের মধ্যেই হারিয়ে যাচ্ছে। কপটতা, শঠতা ও মিথ্যাচারের সংস্কৃতি প্রবল হয়ে উঠছে।

দুর্নীতি দমনে সবচেয়ে জরুরি হলো—মানুষের মধ্যে শক্তিশালী নৈতিকতা, সততা, দায়িত্ববোধ ও সামাজিক ব্যক্তিত্ববোধ গড়ে তোলা। এ বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করতে হবে যে দুর্নীতিবাজ যতই ক্ষমতাধর হোক, তারা কোনো ছাড় পাবে না, শাস্তি হবেই। দুর্নীতির সম্পদ রাষ্ট্র ক্রোক করবেই। আইন ও বিচারব্যবস্থায় এ বার্তাটিই শাসনব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনতে পারে। অতএব, সমাজ, রাষ্ট্র, পরিবার সর্বস্তরে নৈতিকতার জাগরণ এখন সময়ের দাবি।

নৈতিকতা জাগ্রত হলে ন্যায়, মানবিকতা, সততা, দেশপ্রেম ও দায়িত্ববোধের পথ খুলে যায়। আর সেই পথেই গড়ে ওঠে সুন্দর সমাজ, নিরাপদ ভবিষ্যৎ এবং মুক্তিযুদ্ধের আদর্শভিত্তিক সত্যিকারের বাংলাদেশ। এটাই সর্বস্তরের প্রত্যাশা।

লেখক : ব্যাংকার

CamScanner

ব্যর্থতার বৃত্ত পেরোতে পারল না কপ৩০

মোতাহার হোসেন

আমাজন লাগোয়া শহর বেলেমে টানা দুই সপ্তাহের 'কপ৩০' সম্মেলন ধরিত্রী রক্ষায় আশার আলো জ্বালাতে ব্যর্থ হয়েছে। মূলত এ ব্যর্থতার দায় শুধু আয়োজক দেশ ব্রাজিলের নয়, বরং তা শিল্প উন্নত দেশ এবং পৃথিবীর বন-হাওয়া রক্ষার দায়িত্বে থাকা জাতিসংঘেরও। কারণ, বিগত কপগুলোর মতো এবারের জলবায়ু সম্মেলনে সেই একই ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে! বিগত ২৯টি সম্মেলনের মতো এবারও ব্যর্থতার কুয়াশায় ভরপুর! অন্যবারের মতো এবারও আকাশচুম্বী ফর্দ বিশেষ করে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার হ্রাস, তথা কার্বন নিঃসরণ কমানোর প্রতিশ্রুতি নিয়ে জাঁকজমকপূর্ণ আড়ম্বরে সাজিয়ে তোলা এ বিশ্ব আয়োজন যথারীতি অপূর্ণতার গ্লানিতে ঢেকে গেছে। শুধু তাই নয়, পূরণ হয়নি জলবায়ু ঝুঁকিতে থাকা বাংলাদেশসহ ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র ও আমাজনের আদিবাসীদের 'চৌদ্দপুরুষের মনোবাসনা'। আদিবাসীই শুধু নয়; শিল্প-বিপ্লব, পুঁজিবাদ, নগরায়ণে অতিষ্ঠ পুরো ধরিত্রীবাসীই হতাশ! গত শনিবার বড় কোনো চুক্তি ছাড়াই ব্যাপক হইচইয়ের পর চরম হতাশাজনকভাবে শেষ হয় জলবায়ু সম্মেলন-কপ৩০। জলবায়ু বিশেষজ্ঞ, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ছাড়াও আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমও তাদের পর্যালোচনায় 'কপ৩০'কে ব্যর্থ এবং নিষ্ফল' বলে অভিহিত করেছে।

অথচ আশার আলো হাতে ছুটে আসা বাংলাদেশসহ ছোট ছোট দ্বীপরাষ্ট্রের প্রতিনিধিরাও দিনশেষে সম্মেলনটি 'অপূর্ণ' বলে মন্তব্য করেছেন। 'জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার রোধ এবং বন নিধন ঠেকানো' সম্মেলনের সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। মূলত বিশ্বের প্রভাবশালী জীবাশ্ম জ্বালানি রপ্তানিকারী দেশগুলোর প্রচণ্ড বিরোধিতা ও বাধার মুখে ভেস্তে যায় আলোচনা। শেষমেশ দূষণের প্রভাব কমাতে দরিদ্র দেশগুলোকে অর্থ সহায়তাবিষয়ক একটি নামমাত্র চুক্তির মধ্য দিয়ে যবনিকা হলো এবারের জলবায়ু আসর।

সম্মেলন আয়োজক দেশ ব্রাজিল জানিয়েছে, কপ৩০ বিশ্বব্যাপী জলবায়ু সহযোগিতার 'টার্নিং পয়েন্ট'। ফসিল জ্বালানির ভবিষ্যৎ, জলবায়ু তহবিল ও নিঃসরণ কমানো—এসব বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছাতে দেশগুলোকে আহ্বান জানায় তারা। কপ৩০-এর সভাপতি আন্দ্রে করেয়া দে লাগো বলেন, 'এ ইস্যু আমাদের বিভক্ত করতে পারে না। আমাদের অবশ্যই একটি সমঝোতায় পৌঁছাতে হবে।'

মূলত জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বন্ধ করাসংক্রান্ত ভাষা গ্রহণ করতে অস্বীকার করায় তেলসমৃদ্ধ সৌদি আরব ও রাশিয়া, কয়লা উৎপাদক দেশ ভারত, চীন এবং অন্যান্য উদীয়মান দেশকে দায়ী করেছেন ফ্রান্সের পরিবেশমন্ত্রী। ২০২৩ সালে দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত কপ২৮ চুক্তিতে জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে সরে আসার পদক্ষেপের কথা বলা হয়। কিন্তু বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রধান কারণ তেল, গ্যাস ও কয়লার ব্যবহার ধাপে ধাপে বন্ধ করার প্রচেষ্টা বাস্তবায়নে ব্যর্থতায় হতাশা দেখা দেয়। ধনী দেশ, উদীয়মান অর্থনীতি, ছোট দ্বীপরাষ্ট্রসহ ৩৬টি দেশ একটি চিঠিতে আয়োজক দেশ ব্রাজিলকে সতর্ক করে। তাদের ভাষ্যে—তেল, কয়লা ও গ্যাসের ব্যবহার থেকে সরে আসার পরিকল্পনা ছাড়া কোনো চুক্তি তারা গ্রহণ করবে না। চুক্তিটি হলো—বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাব ঠেকাতে দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোকে অর্থসহায়তা বৃদ্ধি।

জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় ২০৩৫ সালের মধ্যে অর্থসহায়তা তিনগুণ বাড়ানোর বিষয়ে একমত হয় ধনী ও প্রভাবশালী রাষ্ট্রগুলো। শেষমেশ আয়োজক দেশ বাধ্য হয়ে চুক্তি থেকে 'জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার হ্রাস-সংক্রান্ত এজেন্ডা বাদ দিয়েই কপ৩০-এ চূড়ান্ত জলবায়ু চুক্তি সম্পন্ন করা হয়। কপ৩০ জলবায়ু সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর সভাপতিত্বে একটি সমঝোতামূলক জলবায়ু চুক্তি চূড়ান্ত হয়। শনিবার ২২ নভেম্বর ব্রাজিলের বেলেম শহরে স্বাক্ষর হওয়া এ চুক্তি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র দেশগুলোর জন্য আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধি করবে। তবে এ চুক্তিতে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের মূল চালিকাশক্তি জীবাশ্ম জ্বালানি কমানো নিয়ে সরাসরি কোনো উল্লেখ নেই।

মূলত শুক্রবার শেষ হওয়ার কথা থাকলেও আলোচনা গুলো অতিরিক্ত সময়ে গড়ায়। টানা ১২ ঘণ্টার আলোচনার পর ১৯৪টি দেশ ও স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল চুক্তিতে সম্মতি দেয়। ব্রাজিল আশা করছে, চুক্তির মাধ্যমে ভবিষ্যতে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পদক্ষেপে সমন্বয় সম্ভব হবে। অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি না পাঠানো নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। জাতিসংঘের জলবায়ু সেক্রেটারিয়েটের নির্বাহী সেক্রেটারি সাইমন স্টিয়েল বলেন, 'বিশ্বনেতাদের মধ্যে নানা বিভাজন, বিভেদ, বিতর্ক থাকা সত্ত্বেও দেশগুলো একমত হতে পেরেছে। আমরা এখনো লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি।' আলোচনায় জীবাশ্ম জ্বালানি নিয়ে গভীর মতভেদ প্রকাশ পায়। সৌদি আরব ও রাশিয়ার মতো উৎপাদনকারী দেশগুলো তেলের ব্যবহার কমানোর রূপরেখা তৈরিতে বাধা দেয়। চূড়ান্ত চুক্তিতে শুধু ধীরে ধীরে জীবাশ্ম জ্বালানি কমানোর আলোচনা শুরু করার প্রস্তাব রাখা হয়, কিন্তু বনভূমি নিধন রোধ নিয়ে কোনো ব্যবস্থা নেই, যা পরিবেশবাদী গোষ্ঠী ও আয়োজক দেশকে হতাশ করেছে। কিছু প্রতিবেশী দেশ যেমন কলম্বিয়া, পানামা, উরুগুয়ে চুক্তির প্রক্রিয়ার সমালোচনা করে। ইউরোপীয় ইউনিয়নও চুক্তিতে সমর্থন দিলেও কিছু দিক নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে।

কপ৩০-এর মূল লক্ষ্য ছিল গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমানো এবং জলবায়ুর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর জন্য জাতিসংঘের কাঠামো শক্তিশালী করা। চুক্তির ফল কিছুটা সম্ভব হলেও বলছে, বিশ্বব্যাপী সমন্বয় উচ্চাকাঙ্ক্ষী জলবায়ু পদক্ষেপ নেওয়ায় ক্ষেত্রে এখনো অনেক চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে।

ব্রাজিলের আমাজন রেইনফরেস্টের উঠোনে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের কপ৩০ জলবায়ু সম্মেলনে প্রায় ২০০ দেশ স্বল্প পরিসরের একটি চুক্তি মেনে নিয়েছে। অথচ সম্মেলন চলাকালে আদিবাসী সম্প্রদায়গুলো বন ধ্বংসের বিরুদ্ধে সরব বিক্ষোভ করে। তাদের জমিতে কৃষি, তেল অনুসন্ধান, অবৈধ খনন ও কাঠ কাটার প্রকল্প বন্ধের দাবি জানায়। এটা তাদের চাওয়া ছিল—শুধু আর্থিক সহায়তা নয়, ভূমি এবং জীবিকা রক্ষায় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ। শেষ পর্যন্ত এ বিষয়ে কার্যকরী কোনো সমাধান আসেনি। নামমাত্র আলোচনায় শেষ হয়েছে এ আসর।

দুই সপ্তাহজুড়ে সম্মেলনে দীর্ঘ বৈঠকের পরও তেল, কয়লা ও গ্যাসের মতো জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার হ্রাস নিয়ে সরাসরি সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি দেশগুলো। এ বিষয়ে যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়নের পাশাপাশি ভুক্তভোগী ৮০টির বেশি দেশ জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমানো ইস্যুতে জোর দাবি জানায়। তবে বেঁকে বসে সৌদি আরব ও রাশিয়ার মতো দেশ। নিজেদের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে জীবাশ্ম জ্বালানি উত্তোলন ও রপ্তানি বন্ধে রাজি নয় তারা। শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর ভিন্নমতের কারণে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় সম্মেলন ঘিরে। অবশ্য সম্মেলনের প্রেসিডেন্ট আন্দ্রে করিয়া দো লাগো বলেন, 'এবারের সম্মেলন থেকে আরও বড় বড় লক্ষ্য অর্জনের আকাঙ্ক্ষা ছিল অনেকের। অনেকেই আশা করেছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে শক্ত হাতে রুখে দাঁড়ানো সম্ভব হবে। আমি তাদের হতাশ করতে চাই না।'

এদিকে সম্মেলনের এমন সিদ্ধান্তে চটেছে কলম্বিয়া, পানামা, উরুগুয়ের মতো কয়েকটি দেশ। প্রশ্ন উঠেছে সম্মেলনের নেতৃত্ব নিয়েও। জানা যায়, শেষ দিনের চূড়ান্ত সভায় চুক্তিবিষয়ক কোনোরকম আপত্তি জানানোর সুযোগই দেওয়া হয়নি বিপক্ষে অবস্থানকারী কোনো দেশকে। অন্যদিকে প্রথমবারের মতো জলবায়ু সম্মেলনে অংশ নেয়নি যুক্তরাষ্ট্র। পাঠায়নি কোনো প্রতিনিধি। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি কার্বন নিঃসরণকারী রাষ্ট্রের অনুপস্থিতিও প্রভাব ফেলেছে এবারের সম্মেলনের সিদ্ধান্তে, মনে করছেন অনেকে।

ব্রাজিলের এ সম্মেলন শেষ মুহূর্তে অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। কেননা, প্রস্তাবিত খসড়া চুক্তি প্রত্যাখান করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। তাদের অভিযোগ, খসড়াটি গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ কমানোর বৈশ্বিক প্রচেষ্টায় কোনো অগ্রগতি আনবে না। ইইউ বলছে, প্রস্তাবিত খসড়ায় নিঃসরণ কমানোর পদক্ষেপ দুর্বল। অন্যদিকে কিছু উন্নয়নশীল দেশ অভিযোগ করেছে, ইইউ নিজে ফসিল জ্বালানি নিয়ে কঠোর অবস্থান নিলেও জলবায়ু তহবিল বাড়ানোর ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে না। ইউরোপীয় ইউনিয়নের জলবায়ু কমিশনার ভপকে হোকস্ট্রা বলেছেন, এ প্রস্তাব 'গ্রহণযোগ্য নয়'। এক উন্নয়নশীল দেশের আলোচক বলেন, 'ফসিল জ্বালানির জন্য যদি পথ থাকে, তবে জলবায়ু তহবিলের জন্য পথ থাকতে হবে।'

সম্মেলন দফায় দফায় বিভিন্ন সময় আলোচনায় অচলাবস্থা তৈরি হয় আরব গ্রুপের অবস্থানের কারণে। তেলসমৃদ্ধ ২২টি দেশের এ জোট জানায়, তাদের জ্বালানি শিল্প নিয়ে কোনো আলোচনা 'অগ্রহণযোগ্য' এবং এতে আলোচনাই ভেঙে পড়তে পারে। সৌদি আরব আলোচকদের সতর্ক করে জানায়, তাদের শিল্পকে লক্ষ্য করলে 'আলোচনার পতন' ঘটবে। ফলে সর্বোপরি আমরা এ প্রত্যাশা করি যে, জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার হ্রাসে তুরস্কে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া 'কপ-৩১' ধরিত্রী রক্ষায় বিশ্বকে আশার আলো দেখাতে সক্ষম হবে।

লেখক: সম্পাদক-ক্লাইমেট জার্নাল২৪.কম এবং সাধারণ সম্পাদক-বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ জার্নালিস্ট ফোরাম (বিসিসিজেএফ)

● প্রকাশিত নিবন্ধের বক্তব্য ও দায়িত্ব লেখকদের নিজস্ব

CamScanner

ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে রাজধানী, প্রতিরক্ষার উপায়

আসাদুজ্জামান খান মুকুল

শিক্ষক, *কবি, লেখক ও প্রাবন্ধিক*

ঢাকা শহর কি সত্যিই আজ মানুষের জন্য এক অবধারিত মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে? নিত্যদিনের অসংখ্য সমস্যায় জর্জরিত রাজধানী। তার ওপর যোগ হয়েছে ভূমিকম্পের বাড়তি আতঙ্ক। 'ভূমিকম্প' নামটা মাত্র তিন অক্ষরের। কিন্তু এই শব্দটি শুনলেই বুকের ভেতর অকারণে কেঁপে ওঠে। ঠিক যেন হঠাৎ মাটি নড়ে উঠলে শরীর যেভাবে আঁতকে ওঠে, তেমনই। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, বিষয়টি আর কোনো দূর-আকাশের আশঙ্কা নয়; এটি আজ আমাদের ঘুম ভাঙার, কিংবা রাতের দিকে চোখ বন্ধ করার সময়ের অদৃশ্য সঙ্গী। প্রকৃতি যে কখন কোন রূপ নেবে, তার ওপর আমাদের হাত নেই।

এটা আমরা জানি। কিন্তু যখন আশঙ্কাটির ছায়া ঘনিয়ে আসে নিজের শহর, নিজের নির্মাণ, নিজের ভবিষ্যৎকে ঘিরে তখন বিষয়টা নিছক অনুভূতি নয়, রক্তের ভেতরেই এক অস্বস্তিকর স্পন্দন তৈরি করে।

বাংলাদেশের ভূ-গাঠনিক অবস্থান নিয়ে কথা বলতে গেলে আমি মনে করি, 'যদি' বা 'হয়তো' দিয়ে ঝুঁকি ঢেকে রাখার কোনো সুযোগ নেই। হিমালয় অঞ্চলের উত্তেজিত টেকটোনিক চাপ আর পূর্ব দিকের ইন্দো-বার্মা প্লেটের নিরবিচ্ছিন্ন ধাক্কা, এই দুই শক্তির ঠিক মাঝখানে বসে আছে আমাদের দেশ। নরম পলিমাটিতে দাঁড়িয়ে থাকা এক উঁচু জনপদ। বছরের পর বছর ধরে জমতে থাকা এই চাপের কথা ভূতত্ত্ববিদরা বহুবার সতর্ক করে বলেছেন। রিখটার স্কেলে ৭ কিংবা তার বেশি মাত্রার একটি বড় ভূমিকম্প যেকোনো সময় ঘটতে পারে। এটা আর কোনো 'তত্ত্ব' নয়; এটি নগরবাসীর জীবনের জন্য সরাসরি একটি দৈত্যাকার হুমকি।

কিন্তু প্রকৃতির নিয়মের চেয়েও আমাকে বেশি ভাবায় আমাদের নিজেদের দুর্বলতা। প্রশ্নটা বড় সহজ। ঢাকা আসলে এত ঝুঁকিতে কেন? কারণ শহরটি দাঁড়িয়ে আছে ভরাট করা আলগা, নরম মাটির ওপর যা ভূকম্পনের শক্তিকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। শহরের চারদিকে তাকালে মনে হয়, যেন অসংখ্য ভবন তড়িঘড়ি করে, নিয়ম-নীতিকে উপেক্ষা করে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। কোথাও কোনো নিরাপত্তার নিশ্চয়তা নেই। মনে হয়, বিশাল এক উল্টো পিরামিড তৈরি করে আমরা তার তলাটা কাদামাটির ওপর দাঁড় করিয়ে রেখেছি।

তারপরও প্রশ্নটা সকলের মাথায় ঘুরপাক খায় ৭ মাত্রার একটি ভূমিকম্প হলে কী হবে? আমি যখন চোখ বন্ধ করে কল্পনা করি, তখন দেখি দুর্বল রড, নিম্নমানের সিমেন্ট আর অপরিকল্পিত নকশায় তৈরি অসংখ্য দালান বালির বাঁধের মতো গুঁড়িয়ে পড়ছে। একটি ভবন ধসে পড়লেই যে শুধু তার ভেতরে থাকা মানুষেরা ঝুঁকিতে পড়বে তা নয়, শহরের সরু অলিগলিতে ও ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা পাশের ভবনগুলোও টেনে নামাবে। ঢাকার অনেক অংশ যে আজ সত্যিই বিপর্যয়ের সীমান্তে দাঁড়িয়ে এটা আর অস্বীকার করার কিছু নেই।

সমস্যার গোড়াটা কোথায়? আমার দৃঢ় ধারণা, এর মূলে রয়েছে বহু বছরের সমষ্টিগত অবহেলা। কতজন বাড়িওয়ালা নতুন ভবন নির্মাণের আগে সঠিক 'মাটি পরীক্ষা' করেছেন? চারতলার অনুমোদন নিয়ে ছয়তলা বানানো, নকশা বদলে ফেলা, নিম্নমানের বালু-সিমেন্ট ব্যবহার করা, এসব যেন এখন প্রকাশ্য রহস্য। নিয়ম ভাঙার সংস্কৃতি এমনভাবে রক্তে ঢুকে গেছে যে, ভুলগুলোর দাম দিতে হতে পারে হাজারো প্রাণ দিয়ে। কিন্তু আমার সবচেয়ে বড় ভয় কেবল ভবন ধসে পড়ার দৃশ্য নিয়ে নয়। আরও ভয়াবহ হলো-তারপর কী হবে? বিশেষজ্ঞদের বহুবার বলা সেই সতর্কতা একটি বড় ভূমিকম্পে ঢাকার এক-তৃতীয়াংশ ভবন ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এটা ভাবলেই শিউরে উঠতে হয়। গুলশান, বারিধারা, বসুন্ধরার ঝকঝকে চেহারা যে মুহূর্তেই ম্লান হয়ে যাবে। পুরান ঢাকার কথাই বা বাদ দিই কীভাবে? সরু গলি, বিপজ্জনক ভবন, গ্যাসলাইন, পুরোনো বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায় কোনো উদ্ধারকারী দল কি সেখানে দ্রুত পৌছাতে পারবে? ভূমিকম্পের পর পানি-বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্নতা আর গ্যাসলাইন বিস্ফোরণের আশঙ্কা যোগ হলে পরিস্থিতি যেন এক বাস্তব নরককুণ্ডে পরিণত হতে পারে।

এই অবস্থায় প্রশ্নটা খুবই সহজ। আমরা কি সত্যিই অসহায়? নাকি প্রস্তুতির মাধ্যমে ক্ষতি অনেকটাই কমাতে পারি? আমার বিশ্বাস, আমরা চাইলে অবশ্যই পারি। সবকিছু সরকারের ওপর ছেড়ে দিয়ে বসে থাকা এক ধরনের আত্মসমর্পণ। নিজের জীবন রক্ষার দায়িত্ব প্রথমত নিজেরই। প্রথম কাজ হওয়া উচিত নিজের বাড়িকে নিরাপদ করা। ভবনের প্রকৃত শক্তি সম্পর্কে অনেকেই নিশ্চিত নন। তাই একটি নিরপেক্ষ প্রকৌশলীর মাধ্যমে কাঠামো পরীক্ষা করা জরুরি। প্রয়োজন হলে 'রেট্রোফিটিং' করে ভবনকে শক্তিশালী করতেই হবে। এটা খরচ নয়, জীবনরক্ষা। নতুন নির্মাণ হলে অবশ্যই বাংলাদেশ জাতীয় ইমারত বিধি পূর্ণভাবে অনুসরণ করতে হবে। কোনো ব্যতিক্রম নয়। পরবর্তী কাজ অনুশীলন। ভূমিকম্পের সময় কী করতে হবে, এই মৌলিক জ্ঞান অনেকেই জানেন না। 'নুইয়ে পড়া, শক্ত কোনো জিনিসের নিচে আশ্রয় নেওয়া এবং সেটিকে শক্তভাবে ধরে থাকা।' এগুলো নিয়মিত অনুশীলন করা উচিত। স্কুল-কলেজ-অফিসে জরুরি মহড়া চালু থাকা অপরিহার্য। তারপর জরুরি কিট। প্রতিটি বাড়িতে থাকা উচিত এক ব্যাগ যাতে থাকবে পানি, খাবার, টর্চ, গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র, হুইসেল, কিছু ওষুধ, যা অন্তত ২৪ ঘণ্টা টিকে থাকার সামান্য হলেও নিশ্চয়তা দেবে।

সরকারের ভূমিকাও এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঝুঁকিপূর্ণ ভবন চিহ্নিত করে সংস্কার বা উচ্ছেদের টাইমলাইন নির্ধারণ করা, উদ্ধারকারী দলকে আধুনিক সরঞ্জাম দেওয়া, খোলা জায়গা চিহ্নিত করে প্রস্তুত রাখা। এসব এখন আর বিলম্ব করার বিষয় নয়। স্কুল-কলেজ পর্যায়ে দুর্যোগ শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা সময়ের দাবি। সবশেষে, কমিউনিটির শক্তি। বড় বিপর্যয়ে পেশাদার উদ্ধারকারী দল সব সময় দ্রুত পৌছাতে পারে না। তখন কাজ করবে প্রতিবেশীর দল। প্রতিটি ওয়ার্ডে প্রাথমিক উদ্ধার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবী দল গড়ে তোলা উচিত। কারণ বিপদের প্রথম মুহূর্তগুলোতে তারাই বহু জীবন বাঁচাতে পারে।

ভূমিকম্প আমরা থামাতে পারব না, কিন্তু প্রস্তুতি নিতে পারি। সচেতন হতে পারি। পরিবারকে প্রস্তুত করতে পারি। আমরা যদি ভবনকে শক্তিশালী করি, নিয়ম মানি, কমিউনিটিকে প্রশিক্ষিত করি, তাহলে ঢাকাকে অন্তত মৃত্যুফাঁদ থেকে অনেকটাই নিরাপদ করা সম্ভব।

CamScanner

A National Education, Skills Master Plan for AI, Robotics Era

Kawsar Chowdhury

There is a hard truth every serious Bangladeshi needs to swallow before we talk about anything else: our only real resource is our youth. Not RMG. Not some mythical mineral deposit waiting to be discovered. Just our kids, millions of them. And depending on how we train them, they will become either our superpower or our downfall.

The problem is that the world has quietly delivered its verdict on our education system. Singapore practically treats some of our university degrees as decorative paper. The US takes a polite 17,000 of our students, while India sends the population of an entire district. Employers abroad whisper the same thing: "They're hard-working but unprepared."

And now, just as we are scrambling to catch up, the robotics age is here to collect its dues. The Gulf, our financial lifeline, is openly experimenting with autonomous taxis, robot cleaners, smart surveillance and automated ports. They are not doing it out of spite but because it is cheaper, safer and faster. If we keep exporting low-skill workers, we are preparing our youth for jobs that will be eaten alive by machines. In 10-15 years, the Middle East will not need Bangladeshi drivers or cleaners or generic "helpers". So, the question is not about how we send more people abroad but about how we produce people the future actually needs.

China has already decided that AI is the new literacy. They are raising an AI-native generation while we debate whether coding is "too advanced for schools". By the time we finish arguing, their twelve-year-olds will be using tools that our university graduates have not even heard of. Singapore, meanwhile, has turned skills into a national religion. They do not ask, "Does he have a respectable degree?" They ask, "Can this person actually do anything?" If the answer is no, that's it. Goodbye. Their refusal to fully recognise many Bangladeshi degrees is not an insult. It is a clinical diagnosis: "We have checked your product. It does not meet our standards."

> *I spend a lot of time talking to people in Washington, New York and various capitals. The pattern is the same: everyone likes our demographic story, everyone likes our resilience, but no one is willing to pretend our current education system is fit for the AI and robotics age*

I spend a lot of time talking to people in Washington, New York and various capitals. The pattern is the same: everyone likes our demographic story, everyone likes our resilience, but no one is willing to pretend our current education system is fit for the AI and robotics age.

If Bangladesh behaved like a serious state, it would build one thing above all: a national human capital master plan for the AI and robotics age. A real plan that says, with numbers and timelines, how many of our youth will become technicians, welders, electricians, or EV/solar specialists; how many will become nurses, carers, or allied health workers; how many will become coders, data people, or AI-literate professionals; how many will stay and run factories, schools, farms, logistics, or creative industries; and how many will go through structured pathways to the US, Australia, Europe, Japan or Canada. And it would start early (Class 6), not after HSC when half the damage is already done.

By 2030, every Bangladeshi child should know what AI is and how to use it, the same way they know what a calculator is. From Class 5-6, they should be playing with logic, basic coding, and simple AI tools in Bangla and English. By Class 8, they should be able to ask an AI system to summarise, compare, translate and visualise information and know when it's wrong. By Class 12, a student on a tech track should be dangerous enough to build things, not just consume them. This is not about turning every child into a programmer. It is about making sure no child walks into a 21st-century job market with a 19th-century toolkit. Without AI literacy, our youth will be competing for jobs that AI itself is doing faster, cheaper and better.

Dhaka will not save Bangladesh, but the districts will, if we let them. Every district should become a human-capital factory with a permanent engine: a Counselling Hub starting from Class 6, telling kids and parents the truth about jobs, countries and requirements; an AI and Digital Hub that helps every school hit the "AI for all by 2030" target; and a Skills and Migration Desk that knows exactly how many welders, nurses, carers, technicians and graduates that district can feed into the world each year. This is where the district-level nursing model we have already discussed becomes the template: district quotas, language training, licensing prep, and foreign hospital partners. Copy-paste that logic into trades, tech, logistics, and hospitality.

If your teacher is underpaid, undertrained, afraid of English and terrified of AI, no curriculum reform will save you. We need to treat teachers like we treat pilots and surgeons. You cannot demand a 21st-century student from a 20th-century teacher.

And if we don't? Then robots will slowly, silently and efficiently take the jobs we still think of as "ours". The Gulf will stop needing us. The world will stop noticing us. And we will sit with our degrees, our slogans and our wounded pride, wondering why no one warned us. Except they did. Singapore already has. The rest of the world is hinting. The question is whether we are ready to listen.

The writer is the Co-Chair, Global Bangladeshi Alliance

CamScanner